চারদিকে চক্রান্ত
আসাদ বিন হাফিজ
ক্রুসেড-১১
প্রকাশন

ক্রুসেড – ১১

চারদিকে চক্রান্ত

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ মোবাইলঃ ০১৭১৭৪৩১৩৬০

ক্রুসেড - ১১
চারদিকে চক্রান্ত

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর
'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক:
আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ মোবাইলঃ ০১৭১৭৪৩১৩৬০

পঞ্চম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১২
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০২
প্রচ্ছদ :
প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ :
প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ ৫০.০০

CRUSADE-11
Charthekay Chokrabto
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by : Asad bin Hafiz
Published by : Pritee Prokashon
435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, 01717431360
5th Edition: January 2012
Published on: January 2002

ISBN 984-581-185-X

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী। ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র। একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

▼ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ▼ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ▼ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ▼ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ▼ ভয়াল রজনী ▼ আবারো সংঘাত ▼ দুর্গ পতন ▼ ফেরাউনের গুপ্তধন ▼ উপকূলে সংঘর্ষ ▼ সর্প কেল্লার খুনী ▼ চারদিকে চক্রান্ত ▼ গোপন বিদ্রোহী ▼ পাপের ফল ▼ তুমুল লড়াই ▼ উমরু দরবেশ ▼ টার্গেট ফিলিস্তিন ▼ গাদ্দার ▼ বিষাক্ত ছোবল ▼ খুনী চক্রের আস্তানায় ▼ পাল্টা ধাওয়া ▼ ধাপ্পাবাজ ▼ হেমসের যোদ্ধা ▼ ইহুদী কন্যা ▼ সামনে বৈরুত ▼ দুর্গম পাহাড় ▼ ভন্ডপীর ▼ ছোট বেগম ▼ রক্তস্রোত ▼ রিচার্ডের নৌবহর ▼ মহাসমর

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পুনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?

চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ– **'অপারেশন'**।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের বই

আতংকিত নানকিং ▼ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত▼ ব্ল্যাক আর্মির কবলে ▼ হাইনান দ্বীপে অভিযান ▼ অশান্ত চীন সাগর ▼ বিধ্বস্ত শহর ▼ ড্রাগনহিলের বিভীষিকা ▼ মৃত্যু দ্বীপ ▼ রক্তাক্ত প্রাচীর

খলিফা আল মালেকুস সালেহ ও খৃস্টান সামরিক উপদেষ্টারা উইণ্ডসারের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় মিলিত হয়েছেন। উইন্ডসার খৃস্টান সম্রাট রিমাণ্ডের দূত হয়ে এসেছেন হলবে। নৈশভোজের পর আছে জমজমাট নৃত্যানুষ্ঠান। সবাই সমবেত হয়ে অপেক্ষা করছিল উইণ্ডসারের জন্য। তার আসার সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেন তিনি বিলম্ব করছেন দেখার জন্য অবশেষে মেহমানখানায় লোক পাঠানো হলো।

একটু পর।

উইণ্ডসারকে ডাকতে যাদের পাঠানো হয়েছিল ফিরে এল তারা। উইণ্ডসার নয়, তার বদলে তাদের সাথে আসরে এসে পৌঁছলো উইণ্ডসারের লাশ।

উইণ্ডসারের অপেক্ষায় এতক্ষণ যারা পথ চেয়ে বসেছিল, হতবিহবল হয়ে পড়লো তারা। কেমন করে তিনি নিহত হলেন, কেন হলেন, কিছুই তারা বুঝতে পারলো না। ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই থ' বনে গেল।

লাশ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল খৃস্টান উপদেষ্টা ও সামরিক অফিসাররা। তারা উইণ্ডসারকে খুবই বিজ্ঞ এবং ক্ষমতাধর

অফিসার হিসাবে জানতো। এ ঘটনাকে তারা সহজভাবে মেনে নিতে পারলো না।

ক্ষিপ্ত খৃস্টানরা খলিফা আল মালেকুস সালেহ, তাঁর আমীর, উজির ও সামরিক অফিসারদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো। পারে তো তাদের ধরে মারে, এমনি অবস্থা। যে অকথ্য ভাষায় গালাগালি হচ্ছিল, অন্য সময় হলে হয়তো খলিফার সামরিক অফিসাররা ঝাঁপিয়ে পড়তো তাদের ওপর। কিন্তু এ আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ওরা বিহবল ও ভেঙ্গে পড়লো। প্রতিবাদের সব ভাষা হারিয়ে ওরা বোবা পাথর হয়ে গেল।

শুধু তাই নয়, এ ঘটনায় তারা ভীত-সন্ত্রস্তও হয়ে পড়লো। কারণ, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মোকাবেলায় তারা খৃস্টানদেরকে নিজেদের অভিভাবক ও রক্ষক মনে করতো। তাদের ওপর ভরসা করেই তারা আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। খৃস্টান সম্রাটের দূত হত্যার ফলে তারা নিজেদের জীবন নিয়েই শঙ্কিত হয়ে পড়লো।

গদিচ্যুত খলিফা ও আমীররা ছিল মেরুদণ্ডহীন। খৃস্টানদের তোষামোদী করার মধ্যেই খুঁজে ফিরতো নিজেদের স্বার্থ ও সাফল্য। খৃস্টানরা যখন যা বলতো তাই মেনে নিত মাথা নত করে।

এ ঘটনায় স্বার্থপর মুসলিম নেতাদের অবস্থা খুবই করুণ হয়ে উঠল। কোন বড় রকমের অপরাধ করলে চাকর-বাকররা যেমন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে,

এরাও তেমনি দাঁড়িয়ে রইল ক্ষিপ্ত খৃস্টানদের সামনে।
কেউ কোন প্রতিবাদ না করায় এক সময় কমে এল গালাগালির তোড়। খৃস্টানদের এক সামরিক অফিসার বললো, 'সন্ধ্যায় ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব খুনী রাতের মধ্যে শহর থেকে বেরোতে পারবে না। সকাল হওয়ার আগেই খুনীকে খুঁজে বের করো। প্রয়োজন হলে শহরের প্রতিটি ঘরে তল্লাশী চালাও। পুরো সেনাবাহিনীকে লাগাও এ কাজে।'
আরেক খৃস্টান অফিসার ধমক দিয়ে বললো, 'হা করে দেখছো কি? যাও, মানুষকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে ঘরে ঘরে তল্লাশী চালাও। তাদের সাথে এমন ব্যবহার করো, যেনো আতংকগ্রস্ত মানুষ ভয়ে স্বেচ্ছায় খুনীকে তুলে দেয় সৈন্যদের হাতে।'
'জ্বী! জ্বী! যাচ্ছি।' এক মুসলমান আমীর বললো, 'আমি সৈন্যদের এখুনি আদেশ দিয়ে দিচ্ছি, ভোরের আগেই যেনো খুনীকে পাকড়াও করা হয়। সমস্ত শহরে যেন এখনি ছড়িয়ে পড়ে সেনাবাহিনী।'
'না, তা হয় না!' এক কেল্লাধিপতি বললো, 'এমন হতে পারে না। তল্লাশী শুধু সেই বাড়ীতেই নেয়া যেতে পারে, যার ওপর সন্দেহ করা যায়। সাক্ষী নেই, প্রমাণ নেই, অভিযোগ নেই, অথচ শহরের অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ঘরগুলোতে আচানক গজবের মত টুটে পড়বে সেনাবাহিনী, তা হয় না।'
এতগুলো গণ্যমান্য অফিসার, খৃস্টানদের সামরিক উপদেষ্টা, আমীর-ওমরা এবং স্বয়ং খলিফা যেখানে উপস্থিত ও নিরব, সেখানে কেউ রিমাণ্ডের সামরিক অফিসারের হুকুম অমান্য

করতে পারে এবং এমন জোরের সাথে তার প্রতিবাদ করতে পারে, এ কথা কেউ কল্পনাও করেনি। সকলেই বিস্মিত হয়ে তাকালো তার দিকে। দেখলো, এ বলিষ্ঠ কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে হেম্মাত দুর্গের অধিপতি জুরদিকের কণ্ঠ থেকে।

ইতিহাস জুরদিকের পুরো নাম উল্লেখ করেনি। তার সম্পর্কে শুধু এটুকুই বলেছে, তিনি 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বন্ধু ছিলেন।'

কিন্তু এটা সে সময়ের কথা, তখনো তিনি সুলতান আইয়ুবীর বন্ধু হননি। আস সালেহের অনুগত সৈন্য এবং একটা দুর্গের প্রধান হিসাবেই এ ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তিনি। সম্মিলিত বাহিনীর পরামর্শ সভারও তিনি সদস্য ছিলেন। সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের যেসব পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছিল, তাতে তারও অংশ ছিল উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু মুসলমানদের 'জাত' ধরে যখন খৃস্টানরা গালাগালি করছিল, তখন তার মধ্যে জেগে উঠলো স্বাজাত্যবোধ। রাতের আঁধারে ধনী-গরীব নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমানের ঘরে হানা দেয়ার কথা শুনে আর চুপ থাকতে পারলেন না। বললেন, 'এখানকার অধিকাংশ পরিবার মুসলিম। তারা সবাই পর্দানশীন। আমি তাদের বেইজ্জতি সহ্য করতে পারবো না। এসব ভদ্র ও পর্দানশীন ঘরে সৈন্যরা বেপরোয়া তল্লাশী চালালে তাতে আমাদেরই সম্মানের হানি ঘটবে।'

'খুনী এ শহরেই আছে!' এক খৃস্টান ক্ষীপ্ত কণ্ঠে বললো , 'প্রয়োজনে আমরা সমস্ত শহর তছনছ করে ফেলবো,

প্রতিশোধ নেবো।'

'উইণ্ডসার ছিলেন উচ্চ সামরিক অফিসার, তার খুনের বদলা নিতে গিয়ে কারো ইজ্জত সম্মানের দিকে তাকানোর সুযোগ নেই আমাদের।' আরেক উত্তেজিত খৃস্টানের কণ্ঠ।

'তাহলে তোমাদের অফিসারের খুনের জন্য আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের ঘর তল্লাশীরও কোন প্রশ্ন আসে না। উইণ্ডসার কত বড় অফিসার ছিলেন তা নিয়ে আমারও কোন পরোয়া নেই।' জুরদিক রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন।

'জুরদিক! তুমি চুপ করো!' কিশোর খলিফা আদেশের সুরে বললেন, 'এ সামরিক মেহমানরা বহু দূর থেকে আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন। তুমি কি মেহমানদারীও ভুলে গেছো? অকৃতজ্ঞ হয়ো না! খুনীকে আমাদের ধরতেই হবে।'

খলিফার সমর্থনে আরো অনেকেই কণ্ঠ উচ্চকিত করলো।

'আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে থাকতে পারি এবং আছিও।' জুরদিক বললো, 'কিন্তু নিজের জাতির বিরুদ্ধে যেতে পারি না! খলিফাতুল মুসলেমিন! যদি আপনি দেশের নাগরিকদের অপমান ও পেরেশান করেন তবে নাগরিকরা আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে। আপনি সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যে রণক্ষেত্র তৈরী করছেন সেটা অকেজো হয়ে যাবে।'

'আমরা কোন জাতির পরোয়া করি না।' রিমাণ্ডের সামরিক উপদেষ্টা বললো, 'আমরা খুনীদের খুঁজে বের করবোই। তারা যে বাড়ীতেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাদেরকে পাকড়াও

করে শুলে চড়াবো। এ হত্যাকাণ্ড নিশ্চয়ই সালাহউদ্দিন আইয়ুবী চালিয়েছে। তার পোষা কুকুরদের কখনো ক্ষমা করবো না আমরা।'

'হে, আমার বন্ধুগণ!' জুরদিক বললেন, 'তোমাদের মাত্র একজন অফিসারের খুন তেমন কোন বড় ব্যাপার নয়। তোমরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে হত্যা করতে বহুবার বহু চেষ্টা করেছ। এই সেদিনও ফেদাইনদের পাঠিয়েছিলে তাকে খুন করতে। আমার জানা মতে তারা চার চার বার প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছ।

তোমরা তাকে হত্যা করতে পারোনি, সে ভিন্ন ব্যাপার। সেটা তোমাদের অযোগ্যতা বা অদক্ষতা। আমি তোমাদের সে প্রচেষ্টাকে অন্যায় বলবো না। শত্রু যারই হোক, তারা একে অপরকে হত্যা করার চেষ্টা করেই থাকে। যদি উইণ্ডসারকে সুলতান আইয়ুবীই হত্যা করে থাকে, তবে পার্থক্য শুধু এই, তোমরা আইয়ুবীকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছো, আর তিনি তোমাদের অফিসারকে হত্যা করতে সফল হয়েছেন। তোমরাও তার এমন অনেক অফিসারকে হত্যা করেছো। কিন্তু তিনি জনগণকে সে জন্য হয়রানী ও কোন পেরেশানিতে ফেলেননি।'

কিন্তু জুরদিকের এ বক্তৃতায় কোনই কাজ হলো না, না এতে খৃস্টানরা সন্তুষ্ট হলো, না মুসলমানদের বিবেক জাগ্রত হলো। বরং সমস্ত মুসলমান আমীর ও অফিসাররা একযোগে জুরদিকের বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলো। তারা খৃস্টানদের

অসন্তুষ্ট করতে চায় না। কিন্তু জুরদিক সকলের সম্মিলিত মতামতকে উপেক্ষা করে তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

তিনি বললেন, 'ভদ্রতা ও শালীনতার সীমা অতিক্রম করে অন্যায়ভাবে নাগরিকদের হয়রানী করার কোন অধিকার নেই আমাদের। তোমরা সবাই বললেই একটা অন্যায় ন্যায় হয়ে যাবে না। সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত করার শপথ নিতে হয়েছে আমাকে। সে শপথের কসম, বিনা ওয়ারেন্টে আমি শহরের কোন ঘরেই তল্লাশী চালাতে দেবো না।'

'তবে কি আমরা মনে করবো, তুমি এ খুনের সাথে জড়িত?' এক খৃস্টান বললো, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বেতনভুক কর্মচারী!'

'হলবের কোন বাড়ীতে অন্যায়ভাবে তল্লাশী চালানোর প্রতিবাদ করার অর্থ যদি হয় সে খুনী, তবে এ অপবাদ মাথায় নিতে আমার কোন আপত্তি নেই।' জুরদিক বললেন, 'এবং এ কারণে কেউ যদি আমাকে আইয়ুবীর কর্মচারী ভাবে, তার সে ভাবনা দূর করার জন্য কোন অন্যায় আবদার রক্ষা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমি যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ আমার আদেশই চলবে।' খৃস্টান এক সামরিক অফিসার বললো।

'তোমাদেরকে আমরা ভাড়া করেছি আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। এ জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দেয়া হয়েছে তোমাদের।' জুরদিক বললেন, 'এখানে আমাদের আদেশই

চলবে। কোন ভাড়াটিয়ার আদেশ মেনে চলতে শিখিনি আমরা।’

রাগে বিকৃত হয়ে গেল খৃস্টান অফিসারদের চেহারাগুলো। দাঁতে দাঁত চেপে একজন বললো, ‘আমরা এখানে তোমাদের চাকর হিসাবে আসিনি, এসেছি উপদেষ্টা হিসাবে। আমাদের উপদেশ মেনে চলতে তোমরা বাধ্য।’

‘এটা আমার দেশ। আমরা মুসলমান। অবস্থা আমাদের আপোষে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। যদি তুমি নি:স্বার্থভাবে এখানে আমাদের সাহায্যে এসে থাকো, তবে আমি তোমার সঙ্গে আছি। কিন্তু আমি সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই, আমার জাতির ওপর কোন নিপীড়নমূলক জুলুম চালানো হলে আমি তার প্রতিশোধ নেবো।’

সুস্থভাবে আলোচনার কোন পরিবেশ ছিল না সেখানে। এই বাকবিতণ্ডা ও উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য দু’জন প্রভাবশালী আমীর জুরদিককে ধরে টেনে হিঁচড়ে কামরার বাইরে নিয়ে গেল।

জুরদিককে বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর খৃস্টানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অন্য এক আমীর বললো, ‘দয়া করে আপনারা আমার কথা একটু শুনুন। অবস্থা যা, তাতে জুরদিককে অসন্তুষ্ট করা যাবে না। এ ব্যক্তিকে জোর করে বশ করা সম্ভব নয়। তার কেল্লার সমস্ত সৈন্য তার ইশারায় জীবন দিয়ে দিতেও পিছপা হবে না। শক্তি নয়, তাকে কৌশলে কাবু করতে হবে। আপনারা যদি একটু ধৈর্য ধরেন, তবে তা খুব কঠিন হবে

না।'
তারপর সে খৃস্টানদের সামনে তার পরিকল্পনা তুলে ধরলো।
খৃস্টানরা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে জুরদিককে আবার ভিতরে নিয়ে আসতে বললো। সে এলে তাকে বলা হলো, 'ঠিক আছে, জনগণকে হয়রানী করা হবে না। তবে খুনীদেরকে খুঁজে বের করারও প্রচেষ্টা চলবে।'
জুরদিক বললেন, 'ঠিক আছে। বাড়াবাড়ি না করলে আমি নিজেও চেষ্টা করবো খুনীকে পাকড়াও করতে।'

তিন চারদিন পর জুরদিক হলব থেকে যাত্রা করলেন। তিনি তার কেল্লা হেম্মাতে যাচ্ছিলেন। তিনি শহরে থাকা অবস্থায় তার উপস্থিতিতেই খুনীদের ব্যাপারে অনেক অনুসন্ধান ও তল্লাশী চালানো হয়। কিন্তু তার নিষেধ অগ্রাহ্য করে কোন ঘরেই ব্যাপক তল্লাশী চালানো হয়নি দেখে তৃপ্ত মনেই যাচ্ছিলেন তিনি।
খৃস্টানরা সেদিনের অপমানের কথা ভুলেনি। তারা জুরদিকের দিকে লক্ষ্য রাখছিল আর অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মনে মনে নানা রকম ফন্দি আঁটছিল।
জুরদিকের সঙ্গে ছিল দশ বারো জন রক্ষী যোদ্ধা। তারাও জুরদিকের মত অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন। মরুভূমির বালিয়াড়ি মাড়িয়ে ওরা পাহাড়ী এলাকায় উঠে এল। চারপাশের পাহাড় চূড়া ও উঁচু-নিচু টিলার মাঝখান দিয়ে সরু পাহাড়ী রাস্তা

এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে। জুরদিকরা এগিয়ে চললো সেই সংকীর্ণ পথ ধরে।

সামনে জুরদিক, পেছনে রক্ষী সেনারা সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এলো দু'টি তীর। বিদ্ধ হলো জুরদিকের ঘোড়ার মাথায়।

তীর দুটো জুরদিককে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হলেও হঠাৎ ঘোড়া লাফিয়ে উঠে মাথা তোলায় অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন জুরদিক।

দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে পাগলা ঘোড়ার মত বেসামাল ভঙ্গিতে এলোপাথাড়ি ছুটতে লাগলো ঘোড়া। ছুটে এলো আরও দুটো তীর।

জুরদিকের ভাগ্যই বলতে হবে, এবারও নিশানা ব্যর্থ হলো দুশমনের, তীর দুটো আগের মতই আঘাত করলো ঘোড়ার গায়ে।

শূন্যে লাফিয়ে পড়লো ঘোড়া, পিঠ থেকে আরোহীকে ফেলে দেয়ার জন্য শুরু করলো প্রচণ্ড দাপাদাপি। ডাইনে বায়ে পা ছুঁড়ে সামাল দিতে চাইল মরণযন্ত্রণা।

জুরদিক অশ্বারোহণে ছিলেন অসম্ভব পটু। তিনি ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। মুহূর্তে নিজেকে ছুঁড়ে দিলেন এক পাথরের আড়ালে।

পলকের জন্য থমকে দাঁড়াল রক্ষীরা। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে ছুটল তীরের উৎস সন্ধানে। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো এদিক-ওদিক।

দু'জন করে পাঁচটি দলে ভাগ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ওরা।
এলাকাটা এমন জটিল, কাউকে খুঁজে পাওয়া বা ধরা খুবই মুশকিল। জুরদিক বুঝলো, এটা ভাড়াটে খুনীর কাজ। নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করার জন্য এদেরকে খৃস্টানরা লেলিয়ে দিয়েছে।
ওই ঘটনার পর থেকে খৃস্টানরা জুরদিককে সুলতান আইয়ুবীর বন্ধু বলে সন্দেহ করতে লাগলো। তারা জানে, জুরদিক সাহসী এবং বীর যোদ্ধা। তাকে হত্যা করতে হলে প্রফেশনাল খুনীদেরই নিয়োগ করতে হবে।

জুরদিক সন্তর্পনে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে চট করে উঠে গেলেন এক টিলার ওপরে। ওখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে মেলে ধরলেন দৃষ্টি। অসংখ্য ছোট ছোট টিলা আর বিবর্ণ প্রান্তর ছাড়া কোন জন মানুষের ছায়াও চোখে পড়ল না তাঁর।
রক্ষীরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আততায়ীদের খুঁজে ফিরছিল। হঠাৎ একজন চিৎকার করে বলল, 'জলদি এদিকে ছুটে আসো সবাই! আমি ওদের দেখে ফেলেছি। ধরতে হলে ওদের ঘিরে ফেলতে হবে।'
চিৎকার শুনে অন্য রক্ষীরা ছুটলো সেই দিকে। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল তিনজন লোক। সবাই মুখোশ পরা। কিন্তু তাদের কাছে কোন তীর ধনুক নেই।

একটু দূরে পাহাড়ের এক খাঁজে তিনটি ঘোড়া ছিল। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে পালানোর কোন চেষ্টা করেনি তারা।
মুখোশের কারণে ওদের চেহারা দেখা যাচ্ছিল না, শুধু দেখা যাচ্ছিল চোখ দুটোর নড়াচড়া।
তাদের ধরে নিয়ে এসে জুরদিকের কাছে হাজির করা হলো।
'তোমাদের ধনুক ও তীর কোথায়?' জুরদিক প্রশ্ন করলেন।
'আমাদের কাছে কোন তীর ধনুক নেই, অস্ত্র বলতে শুধু তলোয়ার আছে।' একজন বললো।
'শোন!' জুরদিক শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের চারটি তীরই লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে, আমাকে হত্যা করতে পারোনি। তোমাদের কপাল খারাপ, তোমরা ধরাও পড়ে গেছ। এখন অযথা মিথ্যা বলে নিজেদের অপরাধ আর বাড়িও না!'
'তীর!' ওরা আশ্চর্য হয়ে বললো, 'আমরা কারো ওপর তীর চালাইনি, আমরা নিরীহ মুসাফির! একটু বিশ্রামের জন্য এখানে থেমে ছিলাম। আবার যাত্রা করতে যাবো এমন সময় এই লোকেরা আমাদের ঘেরাও করে ধরে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে।'
জুরদিক হেসে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে শত্রু মনে করি না। যদি তা করতাম তবে তোমাদের তিনজনের গর্দান এতক্ষণে মাটিতে গড়াগড়ি যেত। আমি জানি, তোমরা ভাড়াটে খুনী। আমাকে শুধু বলো, আমাকে হত্যার জন্য তোমাদের কে পাঠিয়েছে? তোমরা সত্য কথা বলে এখান থেকে চলে যাও, তোমাদের কিছুই বলা হবে না।'

দুই মুখোশধারী কসম করে বললো, 'আমরা জানিনা কে বা কারা আপনাকে হত্যার চেষ্টা করেছে। এ ব্যাপারে আমাদের কোন ভূমিকা নেই, আমরা নিরপরাধ।'

কিন্তু তৃতীয় মুখোশধারী কোন কথা বললো না, সে নিরবে তাকিয়ে রইল জুরদিকের দিকে।

'তোমরা বোকামী করে নিজেদেরকে বিপদে ফেলো না।' জুরদিক বললেন, 'অন্যের জন্য নিজের প্রাণ হারাতে যেয়ো না। আমি তো বলেছি, আমি তোমাদের কোন শাস্তি দেবো না। সত্য কথা বললে এখনই তোমাদের মুক্ত করে দেবো।'

মুখোশধারীরা তবুও ইতস্তত: করতে লাগলো, কেউ মুখ খুললো না।

'এদের মুখোশ খুলে দাও।' জুরদিক তার রক্ষীদের বললেন, 'এদের দেহ তল্লাশী করো, সব হাতিয়ার কেড়ে নাও।'

দুই মুখোশধারী চোখের পলকে তলোয়ার টেনে বের করে দ্রুত পিছনে হটে গেল। তৃতীয় মুখোশধারী ছুটে গিয়ে লুকালো তাদের পিছনে। কারণ তার কাছে তলোয়ারও ছিল না।

জুরদিক হো হো করে হেসে বললেন, 'তোমরা কি এতগুলো রক্ষীর মোকাবেলা করতে চাও? একজনের তো আবার তলোয়ারও নেই! যাক, আমি তোমাদেরকে আরও একবার সুযোগ দিচ্ছি এবং এটাই তোমাদের জন্য সর্বশেষ সুযোগ। এরপর আমি বাধ্য হবো তোমাদের ওপর রক্ষীদের লেলিয়ে দিতে। ওরা তোমাদের হাড্ডি-মাংস এক করে দিলে আমাকে

দোষ দিও না!'
রক্ষীরা তাদের ঘিরে রেখেছিল। ওদের একজন বললো, 'আমরাও শেষ বারের মত বলছি, আমরা কেউ তোমাদের ওপর তীর চালাইনি। যে কাজ আমরা করিনি জীবনের মায়ায় তা স্বীকার করলে আসল অপরাধীরা নিস্কৃতি পেয়ে যাবে। আমাদেরকে খুন করলেও তাতে তোমার কোন লাভ হবে না।'
রক্ষী কমাণ্ডার তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কি জানি কি সন্দেহ হলো, সে টান মেরে তৃতীয় মুখোশধারীর মুখোশ খুলে ফেললো।
তার কাছে কোন তলোয়ার ছিল না। মুখোশ খুলে যেতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তার চেহারা। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। মুখোশের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক সুন্দরী যুবতীর মুখ।
জুরদিক বললেন, 'ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'
দুই মুখোশধারীই বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে পিছনে ঘুরে মেয়েটির পাশে দণ্ডায়মান রক্ষীর বুকে তলোয়ার ধরে চ্যালেঞ্জের সুরে বললো, 'যতক্ষণ আমাদের কাছে সব কথা খুলে না বলবে এবং আমাদের সমস্ত কথা না শুনবে, ততক্ষণ এই মেয়ে কারো কাছে যেতে পারবে না।'
তারা আরো বললো, 'আমরা জানি, তোমাদের হাতে আমাদের মরতে হবে। আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোমরা এনেছো তাতে আমাদেরকে তোমরা ছাড়বে না। তবে আমরাও তোমাদের বলতে চাই, এই মেয়েকে তোমরা

জীবিত পাবে না আর অন্তত তোমাদের অর্ধেক লোক এই সংঘর্ষে শেষ হয়ে যাবে।'

জুরদিক তখনও শান্ত। তিনি মুখোশধারীদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা আমার কাছে আর কি শুনতে চাও? আমার কথা তো আমি পরিস্কার করেই বলেছি, তোমরা ভাড়াটে খুনী, আর এই মেয়েটাকে তোমরা পেয়েছো কাজের অগ্রিম হিসাবে।'

'তোমার দু'টি কথাই ভুল।' এক মুখোশধারী বললো, 'আমরা যদি অপরাধী হই তবে সে অপরাধ হচ্ছে, একজন খৃস্টান গোয়েন্দা ও তার সহকারী এক খৃস্টান মেয়েকে আমরা হত্যা করেছি। এটাকে আমরা কোন গোনাহের কাজ মনে করি না। আমাদের দুর্ভাগ্য, পালানোর পথে আমরা তোমাদের হাতে ধরা পড়লাম। কিন্তু আমরা খুশী এই কারণে, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি। এক নির্যাতীত মুসলিম বোনকে খৃস্টানদের কবল থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি।'

'তোমার এ গল্প সত্য হলে আমাকে বলো, তোমরা কে, কোত্থেকে এসেছো এবং কোথায় যাচ্ছো?'

'আমরা হলব থেকে এসেছি এবং আমাদের গন্তব্য এখন দামেশ্ক।'

'উইগুসার ও খৃস্টান মেয়েটিকে কি তোমরাই হত্যা করেছো?' জুরদিক জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু আমার ওপর তীর চালালে কেন তোমরা? আমি তোমাদের শত্রু না বন্ধু তাই বা জানলে

কি করে?'

'আমি আগেও বলেছি, আমরা তোমার ওপর তীর চালাইনি, তবে তোমাকে আমি ভালমতই চিনি। তোমার নাম জুরদিক এবং তুমি হেম্মাত দুর্গের অধিপতি।' মুখোশধারী বললো, 'আর এটাও ভাল করে জানি, তুমি সুলতান আইয়ুবীর শত্রু। কিন্তু তাই বলে তোমাকে হত্যা করার কোন প্রয়োজন পড়েনি আমাদের!

আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। তাঁরই সাহায্যে আমরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হবো। লড়াইয়ের ময়দানে হয় তোমরা খুন হবে নয়তো আত্মসমর্পণ করে বন্দীত্ব বরণ করবে আমাদের। শত্রুকে না জানিয়ে আমরা কারো ওপর আঘাত করি না।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী হাসান বিন সাব্বাহ বা শেখ মান্নান নন। তিনি চ্যালেঞ্জ করে যুদ্ধ করেন, চুরি করে কাউকে হত্যা করেন না।

উইগুসার ও তার সঙ্গী মেয়েটি খুন হয়েছে নিজের দোষে। ওরা আমাদের চ্যালেঞ্জ না করলে ওদের আমরা হত্যা করতাম না! ওদের খুন হওয়ার পেছনে সুলতান আইয়ুবীর কোন আদেশ বা ইচ্ছা ছিল না।'

সে জুরদিকের ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখলো, অনতিদূরে ঘোড়াটি মরে পড়ে আছে। তার মাথা ও গায়ে এখনো বিঁধে আছে আততায়ীর বিষাক্ত তীর।

মুখোশধারী জুরদিককে লক্ষ্য করে বললো, 'আমরা যে তীর

ছুঁড়িনি তা যদি প্রমাণ করতে চাও তাহলে তোমাদের যে কেউ ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে যাও। আমাদের দু'জনের কোন একজনের হাতে তীর-ধনুক দাও। এরপর যত খুশী তীরবেগে অশ্ব চালাও, ডাইনে ও বায়ে এঁকে বেঁকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করো, আমাদের যাকে বলবে সে ছুটন্ত অশ্বপৃষ্ঠ থেকে একটি মাত্র তীর ছুঁড়বে। যদি সে তীর মিস হয় তবে আমাদের গর্দান উড়িয়ে দিও, আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না। আমরা এমন তীরন্দাজ নই, কোন টার্গেটে তীর ছুঁড়লে তা ব্যর্থ হবে। আমরা তীর চালাইনি বলেই এখনো তুমি বেঁচে আছো, আমরা তীর ছুঁড়লে এখন আমাদের কথা শোনার জন্য তুমি আর বেঁচে থাকতে না।'

'তুমি দেখছি অসাধারণ সৈনিক!' জুরদিক বললেন, 'তুমি কি সুলতান আইয়ুবীর সেনাবাহিনীতে আছো?'

'সে প্রশ্ন করার কোন অধিকার নেই তোমার।' মুখোশধারী বললো, 'তুমি কি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্যদলের লোক ছিলে না? তুমি কি ইসলামী জেহাদে বীর মুজাহিদ হিসাবে লড়াই করোনি? সামান্য কেল্লার অধিপতি হওয়ার লোভ তোমার মাথা এমনভাবে বিগড়ে দিয়েছে, এখন তুমি নিজেকে চিনতে পারছো না, তোমার জাতিকে চিনতে পারছো না। ক্ষমতা ও সম্মানের লোভে যে লোক নিজের আত্মার হাহাকার শুনতে পায় না, আমার পরিচয় দিয়ে তার কি কাজ? কাফেরদের সাথে যে নিজের ভবিষ্যত জুড়ে দিয়েছে, সে লোক ইসলামের মুজাহিদদের চিনবে কি করে!'

জুরদিক স্তব্ধ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলো মুখোশধারীর দিকে। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলো না। বিষাক্ত তীরের চেয়েও বক্তার কথার তীর তার বুক যেন ঝাঝরা করে দিয়েছে। মুখোশধারী থামতেই জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এল সেই টিলার চূড়ায়। বাতাসের হাহাকারের ফিসফিসানি শুনতে পেলেও জুরদিকের আত্মার ক্রন্দন ও হাহাকার কেউ শুনতে পেল না।

'তুমি গাছের সেই বিচ্ছিন্ন ডাল, যে ডালের ভাগ্যে ধীরে ধীরে শুকিয়ে মরা ছাড়া কোন গতি নেই।' অপর মুখোশধারী বললো, 'তুমি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নও যে, সুলতান আইয়ুবী তোমাকে হত্যা করার জন্য পেরেশান হবেন। তোমাকে মেরে ফেলে মুক্তি দিয়ে লাভ নেই, বরং সারা জীবন বেঁচে থেকে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্য করলেই তোমার উচিত সাজা হবে। যে খৃস্টানদের পুতুল হয়ে কাজ করছো, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সে খৃস্টানরাই তোমাকে হত্যা করবে।'

'তুমি হলবে গিয়েছিলে শরাব পান করতে, আমোদ-স্ফুর্তি করতে। গিয়েছিলে এ মেয়ের নাচ দেখে চোখ সার্থক করতে।' প্রথম মুখোশধারী বললো, 'কিন্তু একবারও ভাবলে না, এই নর্তকীরা কারা!'

মুখোশধারীর পেছন থেকে এবার কথা বলে উঠল মেয়েটি, 'আমি এক মুসলিম মেয়ে। আমাকে জোর করে ধরে এনে খৃস্টানরা তাদের আসরে আমাকে নাচতে বাধ্য করেছে, আমার শরীর নিয়ে খেলেছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন,

আমি আপনাদেরই এক হতভাগী মেয়ে। আপনারা এতই আত্মবিস্মৃত ও নির্লজ্জ হয়ে গেছেন, নিজের কন্যাকে নষ্ট করতেও আপনাদের বিবেকে বাঁধে না, একটু ঘৃণাবোধও জাগে না।'

মেয়েটির চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। সে উদগত কান্নার গমক সামলে আবার মুখ খুললো, 'আমি খৃস্টানদের সাথে সাত আট বছর কাটিয়ে এসেছি। দেখেছি তাদের, যাদের আপনারা বন্ধু বানিয়ে দাওয়াত করে খাওয়াতে পারলে গর্ববোধ করেন। আমি তাদের অন্তরের সেইসব গোপন কথা শুনেছি, যা কোনদিন আপনাদের কানে আসে না। তাদের সে অট্টহাসি শুনেছি আমি, যা আপনারা শুনতে পান না। ওরা বন্ধুত্বের কথা বলে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়। এক মুসলমানকে লেলিয়ে দেয় অন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে। আর আপনারা যখন তাদের উস্কানিতে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন তারা মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আর আমাদের বলে, 'নাচো সুন্দরী, নাচো!'

পাহাড়ের মতই স্তব্ধ অটল পাথর হয়ে গেছেন জুরদিক। তার কণ্ঠে কোন ভাষা নেই, চোখে পলক নেই, অঙ্গে নেই জীবন্ত মানুষের স্বাভাবিক নড়াচড়া।

রক্ষীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। এমন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন জাঁদরেল ব্যক্তিত্ব কি করে লোকগুলোর এ রূঢ় তিরস্কার নিরবে সহ্য করছেন?

গভীর চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বিভিন্ন ঘটনা,

বিভিন্ন স্মৃতি ভেসে উঠছিল মনের পর্দায়। মনে পড়লো, রিমাণ্ডের সামরিক উপদেষ্টাদের সাথে তার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের কথা। হলবের ঘরে ঘরে তল্লাশীর বিরুদ্ধে তার রুখে দাঁড়ানোর কথা। খলিফা এবং আমীরদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া অগ্রাহ্য করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকার কথা।
তিনি শান্ত, ভদ্র ও নম্র সুরে মুখোশধারীদের বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আমার কেল্লায় নিয়ে যেতে চাই।'
'কয়েদী বানিয়ে?'
জুরদিক সকলকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'না! মেহমান হিসাবে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, তোমাদের তলোয়ার তোমাদের কাছেই থাকবে।'
নিশ্চিন্ত মনে ঘোড়ায় চড়ে বসলো সবাই। জুরদিকের ঘোড়া মারা গিয়েছিল, তিনি এক রক্ষীর ঘোড়া নিয়ে তাতে উঠে বসলেন। কাফেলা এগিয়ে চললো হেম্মাত দুর্গের দিকে।

কাফেলা সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছে। সরু রাস্তা ধরে দু'তিনটি টিলা অতিক্রম করার পর অকস্মাৎ দুটো ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। সকলেই চাইল শব্দের উৎসের দিকে। দেখা গেল এক টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে দুটো ঘোড়া তীব্র বেগে হলবের দিকে ছুটে পালাচ্ছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাদের সাথে রয়েছে তীর ও ধনুক।
'এরাই সম্ভবত তোমাদের খুনী।' বললো এক মুখোশধারী।
সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধাওয়া করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো ওরা।

মুখোশধারীরাও ছুটলো তাদের পেছনে। দু'জনই কোষবদ্ধ তলোয়ার হাতে তুলে নিয়েছে। মেয়েটিও সঙ্গী হলো কাফেলার।

রক্ষীরা ঘোড়া ছুটিয়ে ছুটছিল তাদের পিছনে। সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল দুই মুখোশধারী।

সামনে বালির টিলা, টিলার ওপারে বাঁক নিয়েছে রাস্তা। পালিয়ে যাওয়া আরোহীরা মোড় ঘুরে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। ধাওয়াকারীরা এখনো বেশ পেছনে।

মুখোশধারী দু'জন তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দূরত্ব অনেক কমিয়ে এনেছিল। কিন্তু তখনো আততায়ীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

মোড় ঘুরেই আততায়ী দু'জন গতি কমিয়ে আনলো ঘোড়ার। কাঁধ থেকে ধনুক নামিয়ে ধনুকে তীর জুড়ে পিছু ধাওয়াকারীদের ওপর তীর চালাল। ধাওয়াকারীরা তখনো তীরের আওতার বাইরে, তাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল তীর। কিন্তু পিছু ধাওয়াকারীদের জন্য তা বিপদ ও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

মুখোশধারী দু'জন ধাওয়াকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। টিলার কারণে ওদের দেখতে পায়নি আততায়ী। মোড় ঘুরেই ওরা ওদের সামনে পড়ে গেল। মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান। দু'পক্ষই পরস্পরকে দেখে ঘটনার আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে গেল। আততায়ী দু'জন তীর চালাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু মুখোশধারীরা তাদের সে সুযোগ

দিল না। একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে এক আততায়ীর ঘোড়ার পিছনে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দিল।

ঘোড়া লাফিয়ে উঠল শূন্যে। অন্য মুখোশধারীর তলোয়ারের আঘাতে অপর আততায়ীর একটি হাত কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল দেহ থেকে। প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল ওদের। রক্ষীরা এলে বন্দী আততায়ীদের তুলে দিল ওদের হাতে।

মুখোশধারীরা এবার তাদের মুখোশ খুলে ফেললো। বললো, 'আমরা দু'জন সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা।'

তাদের একজন ছিল খলিল, অন্যজন তার সাথী। আর যারা পালাতে গিয়ে ধরা পড়লো তারাও ছিল মুসলমান। জুরদিককে হত্যা করার জন্য তারাই তীর ছুঁড়েছিল।

এর মধ্যে যার হাত কাটা গিয়েছিল তাঁকে নির্দয়ের মত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দ্বিতীয়জনকে হাজির করা হলো জুরদিকের সামনে। তাকে বলা হলো, 'যদি জীবিত ফিরে যেতে চাও, তবে জলদি বলো, কে তোমাদের পাঠিয়েছে? নইলে যে হাত দিয়ে তীর ছুঁড়েছো সে হাত কেটে ফেলা হবে।'

সে বললো, 'আমাদের দু'জনকে রিমাণ্ডের এক সামরিক উপদেষ্টা পাঠিয়েছে। দু'জন মুসলমান আমীরের উপস্থিতিতে আমাদের বলা হয়েছে, অমুক দিন এতটার সময় জুরদিক হলব থেকে যাত্রা করবে। সে অমুক সময় পাহাড়ী প্রান্তরে গিয়ে পৌছবে।

আমাদের দু'জনকে আশাতীত পুরস্কার দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সেখানে নির্জন প্রান্তরে তোমরা লুকিয়ে থাকবে এবং

জুরদিককে তীরবিদ্ধ করে পালিয়ে আসবে।'
সে আরো বললো, 'নির্দিষ্ট সময়েই আমরা এখানে এসে পৌঁছি এবং রাস্তা থেকে একটু দূরে উঁচু এক টিলার আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আপনাকে আসতে দেখলাম। আমরা সময় মতই তীর ছুঁড়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ ঘোড়া লাফিয়ে উঠায় আমাদের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।
দুর্ভাগ্য আমাদের, দুটো তীরই ঘোড়ার মাথায় গিয়ে বিঁধে। পরে আমরা আরো একবার চেষ্টা করি, কিন্তু আহত ঘোড়ার লাফালাফির কারণে এবারও আমরা ব্যর্থ হই। এরপর আমরা বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি।'
সে বললো, 'এখানে লুকানোর অনেক জায়গা ছিল। আমরা এক জায়গায় ঘোড়া লুকিয়ে রেখে তাদের মুখ বেঁধে দিয়েছিলাম, যাতে ওরা শব্দ করতে না পারে।'
এরপর তীরন্দাজরা কোথায় লুকিয়ে ছিল সে জায়গা রক্ষীদের দেখাল। রক্ষীরা যখন চারদিক ছড়িয়ে পড়ে ওদের খুঁজছিল তখন ওরা সেখান থেকে লুকিয়ে সবই দেখতে পাচ্ছিল।
যখন কেউ একজন চিৎকার করে বললো, 'এদিকে এসো, ধরে ফেলেছি' তখন তীরন্দাজরা দেখলো, রক্ষীরা তিনজন মুখোশধারীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তারা এতে খুবই খুশী হলো, যাক, আপাততঃ জান তো বাঁচলো! কিন্তু তবু তারা সেখান থেকে পালানোর সাহস করলো না। কারণ, ধরা পড়ার কোন রিস্ক নিতে চাচ্ছিল না ওরা।
অনেক পরে যখন জুরদিক তার রক্ষীদের নিয়ে রওনা হলো

তখন ওরা ভাবল, বিপদ কেটে গেছে, এবার যাওয়া যাক।
ওরা ওদের ঘোড়ার কাছে গেল। ঘোড়ার মুখ খুলে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে ছুটলো হলবের দিকে। তারা বুঝতে পারেনি, জুরদিক তাদের পলায়ন টের পাবে এবং টের পেলেও সাথে সাথে পিছু ধাওয়া করবে।
ওদের ধারনা ছিল, খুনী সন্দেহে যাদের জুরদিক বন্দী করেছে তারা অস্বীকার করলেও জুরদিক তাদের বিশ্বাস করবে না এবং আসল ঘাতকরা ধরা পড়েনি এটা টের পাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, তাদের সব ধারনা ও হিসাব ভুল প্রমাণিত করে নিয়তি তাদের ধরিয়ে দিল।
জুরদিক তীরন্দাজকে সঙ্গে নিয়েই হেম্মাতের দিকে রওয়ানা হলেন আবার। অপর তীরন্দাজ ততক্ষণে কাটা বাহুর রক্তক্ষরণে ছটফট করে মারা গেছে।

রাস্তায় জুরদিক খলিল ও হুমায়রার পুরো কাহিনী শুনলো। কেমন করে ওরা উইগুসারকে খুন করেছে খুলে বললো খলিল।
জুরদিক অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, এই ব্যাপক অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে কিভাবে ওরা হলব থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এলো! এক সময় বলেই ফেললো, 'কিন্তু হলব থেকে তোমরা বেরোলে কি করে? ওখানে তোমাদের গরু-খোঁজা করে খোঁজা হচ্ছে টের পাওনি?'

খলিল বললো, 'ওখানে আমাদের এক কমাণ্ডার থাকেন। আমি তার নাম-ঠিকানা বলতে চাচ্ছি না, তিনিই আমাদের বেরিয়ে আসার পথ বের করে দিলেন।'

'কিভাবে?' জানতে চাইলেন জুরদিক।

'নবজাতক এক শিশুর মত একটি পুতুলকে কাপড়ে জড়িয়ে লাশ দাফনের জন্য চার পাঁচজন লোক কবরস্থানে রওনা হলো। কমাণ্ডার হুজুর হিসাবে কাফন পরা লাশ হাতে নিলেন। আমি ও আমার এ বন্ধু মুসল্লীর পোষাকে এবং হুমায়রা পুরুষের বেশে অন্য দু'জনের সাথে হুজুরের শিষ্য হিসাবে লাশের পিছনে কবরস্থানে চলে গেল। কবরস্থান শহরের বাইরে থাকায় ফটকে কেউ আমাদের বাঁধা দেয়নি।

কবরস্থানের পাশে আগে থেকেই তিনটি ঘোড়া রাখা ছিল। হুজুরের অন্য এক শিষ্য সে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কবরস্থান থেকে একটু দূরে।

হলবের সেনাবাহিনীর চোখের সামনে দিয়েই কবরস্থানে গিয়েছিলাম আমরা। জানাজা পড়ানো হলো। লাশ দাফন করে আমরা তিনজন অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দ্রুত সে এলাকা ত্যাগ করলাম।'

কাফেলা কেল্লায় পৌছতে বেশ রাত হয়ে গেল। খলিল, তার বন্ধু এবং হুমায়রাকে সসম্মানে মেহমান হিসেবে কেল্লায় অভ্যর্থনা জানালেন জুরদিক। খলিলকে বললেন, 'খেল্লাত,

আমাকে দুশমন নয়, বন্ধু মনে করো। আমাকে বলো, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এখন কি করছেন? তিনি কি আস সালেহের ওপর শিঘ্রই অভিযান চালাবেন?'

'আমি সুলতান আইয়ুবীর পরিকল্পনা সবটা জানি এমন নয়, তবে যেটুকু জানি তাও এখন আপনাকে বলতে চাই না।' খলিল তাকে বললো, 'এমনকি আমি হলব থেকে কি কি তথ্য নিয়ে যাচ্ছি তাও আপনাকে জানাতে প্রস্তুত নই।'

জুরদিক বললেন, 'সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে আমার ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল। সেই শত্রুতার রেশ ধরেই আমি তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেলাম। তার কারণ যাই থাক, আমি যে ভুল করেছিলাম তা এখন বেশ বুঝতে পারছি। আমার এই উপলব্ধি এসেছে দুশমনের তৎপরতা দেখে। আমি খৃস্টানদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছি। একদিকে তারা আমার সেনাবাহিনী ও আমার দুর্গ ব্যবহার করতে চায়, অন্যদিকে হত্যা করতে চায় আমাকে।

মরহুম নূরুদ্দিন জঙ্গীর কথাই ঠিক। তিনি সব সময় বলতেন, হেলাল ও ক্রুশের মধ্যে আপোষহীন এক যুদ্ধ চলছে। এটা কোন খৃস্টান রাজা ও মুসলমান সুলতানের লড়াই নয়। অমুসলিম কখনো মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। যখন অমুসলিম বন্ধুত্বের হাত বাড়ায় তখন তার হাতে লুকানো থাকে কোন বিষাক্ত ছোবল।'

'আইয়ুবীও সেই একই আদর্শের অনুসারী। তিনি সব সময় বলেন, যেদিন মুসলমানরা অমুসলিমদের বন্ধুত্ব কবুল করবে,

সেদিন থেকে ইসলামের অবক্ষয় ও ধ্বংসের যাত্রা শুরু হবে।'
'এখন আমি বুঝতে পারছি, জঙ্গী ও আইয়ুবী দুরদর্শী বলেই দোস্ত ও দুশমন চিনতে ভুল করেনি ওরা।'
'তবে কি আপনি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে চান?' খলিল বললো, 'আমি একজন সাধারণ সিপাই। একজন কেল্লাধিপতিকে প্রশ্ন করার মত দুঃসাহস দেখানো আমার উচিত নয়। কিন্তু মুসলমান হওয়ার কারণে আমারও হক রয়েছে, কোন মুসলমানকে বিভ্রান্ত হতে দেখলে তাকে এ কথা বলা যে, আপনি ভুল পথে যাচ্ছেন।'
'হ্যাঁ!' জুরদিক বললেন, 'তোমার এ অধিকার আছে। আমি তোমাকে একটি সংবাদ দিতে চাই। এ সংবাদ তুমি চুপি চুপি কেবল সুলতান আইয়ুবীকেই বলবে। আমি কোন লিখিত চিঠি দিতে পারবো না, কোন দূতও পাঠাতে চাই না। তুমি সুলতান আইয়ুবীকে বলবে, হেম্মাত দুর্গকে যেন তিনি আপন দুর্গ মনে করেন। তিনি ছাড়া একথা কোন বিশ্বস্ত সেনাপতিকেও বলবে না। আমি এ তথ্য কঠোরভাবে গোপন রাখতে চাই।
খৃস্টানরা বন্ধুত্বের নামে আমাদের এলাকায় প্রভূত্ব বিস্তার করতে চাচ্ছে। এরই মধ্যে এ প্রভুত্বের থাবা তারা অনেক দূর বিস্তার করে ফেলেছে। তিনি যেন শীতের পরপরেই আক্রমণ চালান। এদিক থেকে আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই তাকে অভিযান শুরু করতে বলবে। আর তিনি যদি আগেভাগেই অভিযান শুরু করতে পারেন তবে যেন হেম্মাতের পথ হয়েই

এগিয়ে যান। আমি ইনশাআল্লাহ পুরাতন বন্ধুত্বের দাবী পূরণ করবো।'

পর দিন ভোরে জুরদিক খলিল, তার সাথী এবং হুমায়রাকে সসম্মানে বিদায় জানালেন কেল্লার ফটকে এসে।

খৃস্টান গোয়েন্দা বিভাগের কমাণ্ডার উইণ্ডসারের খুন হওয়া নি:সন্দেহে একটি আকস্মিক ও বড় রকমের ঘটনা। তিনি সুলতান আইয়ুবীর দুই গোয়েন্দাকে এমন অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে হত্যা না করে তাদের কোন উপায় ছিল না।

ঘটনাটা আকস্মিক হলেও কাজটি ছিল বিরাট। তাকে হত্যার ফলে সুলতান আইয়ুবী বড় রকমের উপকার পেয়েছিলেন। এতে শত্রুর গোয়েন্দা বিভাগ যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল। উল্টো দিকে সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা বিভাগ হয়েছিল আরো মজবুত এবং শক্তিশালী।

তার গোয়েন্দা কর্মীরা শুধু গোয়েন্দাই ছিল না, সুদক্ষ যোদ্ধাও ছিল। সে জন্য ধরা পড়ার ভয় কম ছিল তাদের। মুখ বন্ধ রেখে কিভাবে তথ্য আদায় করতে হয়, সে প্রশিক্ষণ তিনি ভালমতই দিয়েছিলেন। যোদ্ধা হওয়ায় ধরা পড়লে ফাইট করে শত্রুর হাত থেকে সহজেই তারা বেরিয়ে যেতে পারতো। কাউকে হত্যা করার প্রয়োজন হলেও পিছপা হতো না।

তাদের শারীরিক গঠন হতো মজবুত। কঠিন থেকে কঠিনতর

শাস্তি, ক্ষুধা, পিপাসা ও ক্লান্তি সহ্য করার মত পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হতো তাদের।

এসব গুণগুলো খলিল এবং তার সাথীর মধ্যেও ছিল। তারা শুধু খৃস্টানদের বড় এক অফিসারকেই হত্যা করেনি, জুরদিকের মত বীর কেল্লাধিপতির সাথে সাহসের সঙ্গে কথা বলে তার ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে দিয়েছিল, তাকে সুলতান আইয়ুবীর সমর্থক বানিয়ে এসেছিল।

খলিল সুলতান আইয়ুবীকে হেম্মাত দুর্গাধিপতি জুরদিকের সংবাদ শুনালো। সুলতান এ খবর শুনে পরম প্রশান্তি অনুভব করলেন। মরুভূমিতে একটু ঠাণ্ডা বাতাস পেলে মানুষ যেমন শান্তি অনুভব করে, ঠিক তেমনি। তার সামনে তো দুশমন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। ঘরেও শত্রু, বাইরেও শত্রু। জুরদিকের সংবাদ এ ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ব্যতিক্রম।

কিন্তু মনে মনে শান্তি পেলেও এতে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন না। সংবাদটা প্রতারণাও তো হতে পারে! সুতরাং তিনি তাঁর আক্রমণের প্ল্যান পরিবর্তন করলেন না। শুধু এটুকু মনে রাখলেন, হেম্মাত থেকে সাহায্যের আশা করা যায়।

হলব থেকে নিয়মিত সংবাদ পাচ্ছিলেন সুলতান। কিন্তু তাতে কোন নতুনত্ব ছিল না। কোন পরিবর্তন নেই দুশমন শিবিরে। আগের মতই সব রুটিন ওয়ার্ক। সেখানকার কমাণ্ডার ও উপদেষ্টারা নিশ্চিন্ত, শীতকালে আক্রমণের কোন সম্ভাবনা নেই।

এর মধ্যে একটি সংবাদ এল এমন, খৃস্টানরা প্রকাশ্যে

সকলের সাথে বন্ধুত্বের ভান করলেও গোপনে মুসলিম আমীরদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানী দিচ্ছে। একজনের ওপর বিষিয়ে তুলছে অন্যজনের মন।

সুলতান আইয়ুবী আগেও জানতেন, আস সালেহের সমস্ত আমীররা একে অপরের শত্রু। তারা শুধু সুলতান আইয়ুবীকে মোকাবেলা করার জন্যই একত্রে সমবেত হয়েছে।

সুলতান আইয়ুবীর সাথে তাদের শত্রুতার কারণ, তিনি সকলকে আরাম ও বিলাসিতা ত্যাগ করতে বলেন। নিজের আবেগ উচ্ছ্বাস ও ইচ্ছার দাস হতে নিষেধ করেন। নফসের গোলামী বাদ দিয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের গোলামী করতে বলেন। এসব কারণে তারা সুলতান আইয়ুবীর মিশন পছন্দ করে না। কারণ, এসব আমীরদের মনে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও একে স্থিতিশীল করার কোন আগ্রহ ছিল না। তারা বিলাসিতা, অলসতা ও আরাম-আয়েশের জন্য দুশমনকেও বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিল।

সুলতান আইয়ুবী এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সেনাবাহিনীর সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন রাতের ট্রেনিংয়ে কেউ আর অসুস্থ হয় না।

১১৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শুরু। সুলতান আইয়ুবী তাঁর সেনা কমাণ্ডারদের সাথে শেষ বারের মত মিলিত হলেন। কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের সমস্ত অফিসার এবং গ্রুপ কমাণ্ডাররাও এসে সমবেত হলো সেনা ছাউনিতে।

সুলতান আইয়ুবী তাদের বললেন, 'এই মুহূর্ত থেকে সৈন্যদের গতিবিধি সম্পর্কে কোন কথা, তা যত কম গুরুত্বপূর্ণ এবং অপ্রয়োজনীয়ই হোক না কেন, বাইরের লোকদের কাছে বলা যাবে না। যাদের সাথে বিবি-বাচ্চা আছে, তারা বাড়ীতেও এ বিষয়ে কোন আলোচনা করবেন না।

সৈন্যদের অভিযানের সময় হয়েছে, এ কথা কোথাও প্রকাশ করা যাবে না। সবাই জানবে, সৈন্যরা প্রতিদিনের মত কুচকাওয়াজ করতে যাচ্ছে।'

এ নির্দেশের পর তিনি সমবেত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'আমাদের আরামপ্রিয় বন্ধু ও ঈমান বিক্রেতা ভাইয়েরা ইসলামের ইতিহাসকে এমন স্থানে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে তোমাদের প্রিয় বন্ধু ও আত্মীয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আজ ফরজ হয়ে গেছে। কেউ কোন দিন কি চিন্তা করেছো, আমাদের নেতা নূরুদ্দিন জঙ্গী মরহুমের সন্তানের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করবো? কিন্তু অবস্থা আজ এমন, মা তার বুকের ধন আপন সন্তানকে বুক থেকে ছুঁড়ে ফেলেছে দূরে, আর চিৎকার করে অভিশাপের পর অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে। তোমরা কি মরহুম জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর আহাজারী শুনতে পাওনি, শুনতে পাওনি তার হাহাকার ধ্বনি, 'আমার মুরতাদ বেটা কেন এখনও জীবিত? হে আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামের মুজাহিদ ভাইয়েরা, কোথায় তোমরা? ইসলামকে বাঁচাও, আমার গাদ্দার সন্তানের হাত থেকে ছিনিয়ে নাও ক্ষমতার দণ্ড।'

একটু দম নিলেন তিনি। তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'হে আমার বন্ধুরা! তোমরা যে সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছো, তাদের মধ্যে তোমাদের চাচাতো ভাই থাকবে, মামাতো-খালাতো ভাই থাকবে। আমার সেনাবাহিনীর মধ্যে এমন সৈনিকও আছে, যার আপন ভাই ঈমান বিক্রেতাদের দলে শামিল। যদি তোমরা রক্তের সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ককে মনে জায়গা দাও, তবে ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে তোমার।
যুদ্ধে যাওয়ার আগে ভাল করে চিন্তা করে নাও, কোন্ সম্পর্ককে তোমরা অগ্রাধিকার দেবে? যদি রক্তের সম্পর্কের চাইতে ইসলামের সম্পর্কই তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে তোমাদের শপথ নিতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে, সামনে কে আছে সেদিকে তাকিয়ে দেখবো না, আমাদের দৃষ্টি থাকবে শুধু পতাকার দিকে। অন্তরে এ সত্যই শুধু অটুট থাকবে, সামনে যাকে আমার কালেমা পড়া ভাই মনে হচ্ছে, সে আমার ভাই নয়। ইসলামের দুশমনরা তাকে অস্ত্র হিসাবে বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের সামনে। দুশমনের কোন অস্ত্রকেই আমরা অটুট ও অক্ষত রাখবো না। সে কখনো আমার ভাই হতে পারে না, যে আমার ধর্মের বিরুদ্ধে শত্রুদের সাথে মিলে অস্ত্র ধরেছে।'
কথা বলতে বলতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি মাথা নত করে গোপনে চোখের অশ্রু মুছে নিলেন। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উপস্থিত সেনা কমাণ্ডার এবং অফিসারদের মধ্যেও সঞ্চারিত

হলো আবেগের জোয়ার।
সুলতান আইয়ুবী মাথা উঠিয়ে দু'হাত আকাশের দিকে তুলে বলতে থাকলেন, 'হে পরোয়ারদিগার! হে রাহমানুর রাহীম! হে আমাদের প্রভু রাব্বুল আলামীন! তুমি সাক্ষী থেকো, কেবল তোমার নামের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার জন্য, তোমার রাসূলের সম্মানে আজ আমরা নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিটি কদমকে তুমি কেবল হকের পথেই অটল রেখো। তুমি আমাদের অন্তরগুলো দেখতে পাচ্ছো, তুমি জানো, দুনিয়ার কোন সম্পদ, নাম বা ক্ষমতার মোহে আমরা এ অস্ত্র হাতে নেইনি। আমরা আমাদের সর্বোত্তম সামর্থ এবং যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়েছি। এখন তোমার পথ নির্দেশ ও সাহায্যই আমাদের একমাত্র ভরসা। হে আল্লাহ! আমাদের এ সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয়ে থাকে, এখনি তোমার কুদরতি হাত দিয়ে থামিয়ে দাও আমাদের। আর যদি এ সিদ্ধান্ত সঠিক হয়ে থাকে, তবে আমাদের সেই হিম্মত, সাহস ও শক্তি দান করো, যে সাহস ও শক্তি দিয়েছিলে বদরের পূণ্যবান মুজাহিদদের।'
হাত তুলে রেখেই চুপ করে রইলেন তিনি, যেন আল্লাহর তরফ থেকে ইঙ্গিতের প্রত্যাশা করছেন।
এক সময় হাত নামালেন এবং উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন, 'আমরা আমাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত করবো। বায়তুল মুকাদ্দাসের পবিত্র মাটি ব্যাকুল চিত্তে ডাকছে আমাদের। আমাদের চলার পথে যদি আমার বাবাও

বাঁধা দিতে আসে, তাকে খুন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবো না আমি। যদি আমার সন্তান বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, নির্বিচারে তাকে খুন করতে হাত কাঁপবে না আমার।'

আস্তে আস্তে কমে এল তার আবেগ ও উত্তেজনা। তিনি আবার সেই ঠাণ্ডা মাথার সালাহউদ্দিন আইয়ুবী হয়ে গেলেন। কথা বললেন সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজন মাফিক।

কমাণ্ডারদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'দু'দিন সময় দেয়া হলো ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও প্রস্তুতি সম্পন্নের জন্য। তৃতীয় রাতে সেনাবাহিনী মুভ করবে।'

তিনি প্ল্যান অনুসারে সৈন্যদের গ্রুপ ভাগ করলেন। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য নিয়োগ করলেন কমাণ্ডার। কমাণ্ডারদের জানিয়ে দিলেন অভিযানের সময় নির্দেশিকা। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন তাদের।

নিয়মিত সৈন্যদের থেকে আলাদা করলেন কমাণ্ডো বাহিনীকে। তাদের জানিয়ে দিলেন মূল সেনা বাহিনী কখন কোন পথ অতিক্রম করবে। এ সময় কমাণ্ডোদের কাজ কি হবে তাও বলে দিলেন তাদের।

এরপর বিশেষ গোয়েন্দা কর্মীদের নিয়ে বসলেন তিনি। বুঝিয়ে দিলেন তাদের কাজ। কখন কোথায় কিভাবে তারা রিপোর্ট করবে বললেন তাদের। কোন বাহিনী কোথাও কোন বিপদ বা সমস্যায় পড়লে কিভাবে সুলতানের সাথে যোগাযোগ করবে সকলকে জানিয়ে দিলেন।

প্রথমেই তিনি মিশরের রাস্তা বরাবর সদা সতর্ক ও গতিশীল

কমাণ্ডো বাহিনীকে মার্চ করতে বললেন। এর আগে মুসাফির ও যাযাবরের ছদ্মবেশে গোয়েন্দা বিভাগের সৈন্যদের পাঠিয়ে দিলেন ঐ এলাকায়। রিমাণ্ডের আগমন পথে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বললেন তাদের।

বললেন, 'মিশরের আশপাশের নিরাপত্তা এবং রিমাণ্ডের সৈন্য আগমনের পথ রুদ্ধ করা তোমাদের দায়িত্ব। রিমাণ্ডের সৈন্যরা এদিকে পা বাড়ালে তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালাবে। রাতের অন্ধকারে হামলা চালিয়ে সন্ত্রস্ত করে রাখবে ওদের। প্রয়োজন মনে করলে জলদি সংবাদ পাঠাবে, যাতে খৃস্টানদের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করে দেয়া যায়।'

খাদ্য ও রসদের ব্যাপারে সুলতানের কোন পেরেশানী ছিল না। কমপক্ষে এক বছর মিশর থেকে রসদপত্র আনার প্রয়োজন হবে না। অস্ত্রশস্ত্র এবং উট ঘোড়ার মজুদ যা গড়ে তুলেছেন, তাও মন্দ নয়।

তিনি বিভিন্ন বাহিনীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন অতল ভাবনায়। আবারো খতিয়ে দেখতে লাগলেন পরিকল্পনা ঠিক আছে কি না।

১১৭৪ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। রাতের প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে প্রথম দলটি দামেশক ত্যাগ করলো। তীব্র শীতের সাথে হাত মিলিয়েছে তুষার ঝড়। কনকনে হীমশীতল ঠাণ্ডা বাতাস শরীরে কামড় বসাচ্ছে। সৈনিক ও ঘোড়াগুলো এই তুষারপাতের মধ্যেও চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

এতদিনের কঠিন প্রশিক্ষণের মাহাত্ম এই প্রথম টের পেলো সৈন্যরা।
দলের কমাণ্ডারকে সুলতান বলে দিয়েছেন, 'তোমাদের অগ্রযাত্রা নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক করার জন্য কমাণ্ডো দল পাঠানো হয়েছে আগে। তারা সামরিক পোষাকে নয়, মুসাফিরের বেশে আছে। তাদের সাথে আছে দ্রুতগামী কাসেদ। সে তোমার সাথে যোগাযোগ রাখবে। সামনের পরিবেশ পরিস্থিতির সংবাদ জানাবে তোমাকে। বাহিনী নিয়ে তুমি সোজা হেম্মাত দুর্গে চলে যাবে। সেখানে দুর্গের অধিপতি জুরদিক তোমাদের অভ্যর্থনা জানাবেন।'
সুলতান আইয়ুবী কমাণ্ডারকে আরো বলে দিলেন, 'হেম্মাত দুর্গ যুদ্ধ ছাড়াই আমাদের হস্তগত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তোমরা সতর্ক ও সাবধান থাকবে। কোন অবস্থাতেই প্রবঞ্চণায় পড়বে না। দুর্গ থেকে দূরে উপযুক্ত স্থানে থেমে যাবে। লক্ষ্য করবে, দুর্গাধিপতির মনের ভাব। যদি জুরদিক আপোষে দুর্গ হস্তান্তর করতে রাজি হয়, তবে তাকে দুর্গের বাইরে আসতে বলবে।
সে দুর্গের বাইরে এলে দুর্গ আক্রমণের কোন দরকার নেই। কিন্তু তুমি নিজে তার সাথে আপোষ বা চুক্তি কোনটাই করবে না। তাকে বলবে, সুলতান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তিনিই আপনার সাথে সন্ধির শর্ত নির্ধারণ করবেন।
খবরদার! তার কথায় প্রভাবিত হয়ে তোমরা কেল্লায় প্রবেশ করবে না। আর যদি জুরদিক মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে

মুজাহিদদের ঈমানের শক্তি কেমন তা তাকে বুঝিয়ে দেবে। কাসেদ মারফত সাথে সাথে এ খবর পাঠিয়ে দেবে আমার কাছে।'

সুলতান আইয়ুবী দেয়াল ভাঙ্গায় পারঙ্গম এক দল সৈন্যকে আলাদাভাবে আগেই পাঠিয়েছিলেন হেম্মাতের পথে। প্রথম দলটি যাত্রার তিন চার ঘন্টা পর আরও দুটো সৈন্য দলকে হেম্মাতের পথে যাত্রা করার হুকুম দিলেন। এক দলকে প্রথম দলের ডাইনে এবং দ্বিতীয় দলকে প্রথম দলের বায়ে অবস্থান নিয়ে এগিয়ে যেতে বললেন।

তাদের বলে দিলেন, 'যদি প্রথম দলের সাথে হেম্মাত দুর্গের সৈন্যদের মোকাবেলা শুরু হয়, তবে তোমরা দু'দল দু'দিক থেকে অগ্রসর হয়ে দুর্গ অবরোধ করে ফেলবে। তোমরা দুর্গের ওপর এমনভাবে তীর বর্ষণ করবে, যেন দেয়াল ভাঙ্গা বাহিনী দেয়াল পর্যন্ত পৌছে যেতে পারে।'

এ দুই দল যাত্রা করার কিছুক্ষণ পর। সুলতান আইয়ুবী স্বয়ং একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন হেম্মাতের পথে।

এই নিয়ে পর পর চারটি দল হেম্মাতের উদ্দেশ্যে দামেশক ত্যাগ করলো।

অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য দামেশকেই রয়ে গেল। তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েই যুদ্ধ জয়ের চিন্তা করছিলেন।

রসদপত্র সরবরাহের দায়িত্ব ছিল কমাণ্ডো বাহিনীর একাংশের ওপর। তারা রসদসহ ছোট ছোট দলকে হেম্মাতের পথে পাঠিয়ে দিল।

হেম্মাত থেকে হলবের পথ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল ছদ্মবেশী কমাণ্ডো বাহিনী। কোন কাসেদ যেন হেম্মাতের খবর হলবে পৌঁছাতে না পারে এ জন্যই এ ব্যবস্থা। ওদের ওপর নির্দেশ ছিল, 'কোন দিক থেকে সাহায্য আসা শুরু হলে কমাণ্ডো আক্রমণ চালিয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে।'

দিন গড়িয়ে রাত এল। রাতও ক্রমেই গভীর হতে থাকলো। মুজাহিদদের অগ্রযাত্রা থেমে নেই, এগিয়েই চলেছে তারা। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে প্রথম দলটি হেম্মাত দুর্গ থেকে দু'তিন মাইল দূরে এসে অবস্থান নিল।

৯ ডিসেম্বরের সকাল। কেল্লার ওপর দাঁড়ানো প্রহরীরা তাকিয়েছিল খোলা প্রান্তরের দিকে। অন্ধকারের প্রকোপ কমে এল, কুয়াশা হালকা হলো সামান্য। ওদের মনে হলো, দূরে মরুভূমিতে কালো কালো আবছা ছায়া দেখা যাচ্ছে। ভাল করে তাকালো ওরা। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে অনেক মানুষ ও ঘোড়া। ওরা ভাবল, কোন কাফেলা হবে হয়ত।

সূর্য ওপরে উঠতে লাগলো, প্রহরীরা দেখলো, এটা কোন সাধারণ কাফেলা নয়, নিয়মিত সেনাবাহিনীর একটা দল। কেল্লার ডাইনে বায়ে সৈন্যদের যে ঘেরাও, তা তখনো ওদের চোখে পড়েনি।

সঙ্গে সঙ্গে হেম্মাত দুর্গে বেজে উঠলো জরুরী বিপদ সংকেত। এক কমাণ্ডার দৌড়ে ওপরে গেলো। তাকিয়ে দেখলো সৈন্যদের। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটলো নিচে, দৌড়ে গিয়ে কেল্লার অধিপতি জুরদিককে খবর দিল।

‘ভয় পেয়ো না!’ জুরদিক কমাণ্ডারকে বললেন, ‘এটা কোন আক্রমণকারী সেনাদল নয়। আক্রমণকারী হলে রাতেই ওরা আঘাত হানতো। হতে পারে, খৃষ্টানরা আমাকে হত্যা করতে না পেরে অন্য কোন ষড়যন্ত্রে আছে। হয়ত খলিফা আস সালেহের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হেম্মাত কেল্লা আমার কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দিতে চায়। পেরেশান হওয়ার দরকার নেই, বাইরে গিয়ে ওরা কারা এবং কি চায় আগে খোঁজখবর নাও।’

কমাণ্ডার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেরিয়ে গেলো কেল্লা থেকে। সুলতান আইয়ুবীর প্রথম বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেল সে। দেখলো সুলতান আইয়ুবীর পতাকা উড়ছে ওখানে। ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসতে চাইলো সে।

আইয়ুবীর দলের কমাণ্ডার ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল তার কাছে। কাছাকাছি হতেই দু'জন দু'জনকে চিনতে পারলো। দু'জনই নূরুদ্দিন জঙ্গীর সেনাবাহিনীতে একত্রে কাজ করেছে।

‘এই আমাদের ভাগ্যে ছিল!’ আইয়ুবীর কমাণ্ডার বললো, ‘জঙ্গী যদি বেঁচে থাকতেন তবে আমরা থাকতাম পরস্পর বন্ধু ও সঙ্গী। তিনি মারা গেছেন আর আমরা পরস্পর শত্রু হয়ে গেলাম!’

‘তোমরা কেন এসেছ?’ কেল্লার কমাণ্ডার জিজ্ঞেস করলো।

‘তোমরা এ দুর্গ আর নিজেদের দখলে রাখতে পারবে না।’ আইয়ুবীর কমাণ্ডার বললো, ‘তোমার দুর্গাধিপতিকে গিয়ে বলো, কেল্লা আমাদের হাতে তুলে দিতে। কোন রক্তাক্ত যুদ্ধে

জড়িয়ে লাভ নেই। ওতে কেবল হতাহতের সংখ্যাই বাড়বে। আপোষে সংঘর্ষ না এড়ালে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কেল্লা অবরোধ করতে বাধ্য হবো।

কোথাও থেকে কোন সাহায্য পাবে না তোমরা, তোমাদের সাহায্যের সব পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অস্ত্র সমর্পণ করে অযথা রক্তক্ষয় এড়ানোর জন্য আমি অনুরোধ করছি তোমাদের।'

কেল্লার কমাণ্ডার এর কোন জবাব না দিয়ে ফিরে গেলো জুরদিকের কাছে। জুরদিককে বললো, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ফৌজ আক্রমণ করেছে আমাদের। তারা অস্ত্র সমর্পণ করে রক্তক্ষয় এড়াতে বলছে।'

জুরদিক চিৎকার করে বললো, 'তুমি ঠিক বলছো! সালাহউদ্দীন আইয়ুবী এসেছেন! তাহলে আর বসে আছো কেন? কেল্লার ওপর থেকে খলিফার পতাকা নামিয়ে নাও। ওখানে উড়িয়ে দাও সাদা পতাকা। না, কোন সংঘাত নয়, আইয়ুবীর সাথে লড়াই করে মরতে দেবো না আমার কোন সৈন্যকে! উড়াও, জলদি শান্তির পতাকা উড়িয়ে দাও কেল্লার ওপর।'

তিনি আবেগে দৌড়ে বাইরে চলে এলেন। অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে এগিয়ে গেলেন আইয়ুবীর বাহিনীর দিকে।

আইয়ুবীর সেনাদলের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তিনি। তিনি মনে করেছিলেন, সুলতান আইয়ুবী নিজেই আছেন সৈন্যদের সাথে। বললেন, 'কোথায় মোহতারাম আইয়ুবী?'

'তিনি এখনো এসে পৌঁছেননি।' জবাব দিল আইয়ুবীর বাহিনীর সালার।
'কিন্তু আমি তো তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে চাই!'
'অবশ্যই তাঁর সাথে কথা বলবেন। আগে বলুন, আপনি কি লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, নাকি আত্মসমর্পন করবেন?'
'আমি এর কোনটাই করবো না। আমি কি করবো তা কেবল সুলতানকেই বলবো।'
'ঠিক আছে। আপনি কি তাহলে সুলতান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন?'
'না, সুলতান কোথায় আছেন ওখানে আমাকে নিয়ে চলো। আমি যত শিগগির সম্ভব সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'
সুলতান তখনো অনেক পেছনে। জুরদিক তখুনি আইয়ুবীর একজন সেনা কমান্ডারকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান যেখানে আছেন সেদিকে রওনা হয়ে গেলেন।

সুলতান আইয়ুবী জুরদিককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। জুরদিক তার পূর্ব শত্রুতার কথা তুলে ক্ষমা চাইলেন সুলতানের কাছে। উভয়েই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। অতীতের কথা ভুলে নতুন করে বন্ধুত্বের বন্ধনে জড়িয়ে নিলেন পরষ্পর পরষ্পরকে।
এরপর জুরদিক আইয়ুবীকে নিয়ে হেম্মাত দুর্গে গেলেন। সমস্ত সৈন্যসহ দুর্ভেদ্য কেল্লা তুলে দিলেন সুলতান আইয়ুবীর হাতে। সুলতান আইয়ুবী তাঁর কেন্দ্রীয় কমাণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে কেল্লায়

প্রবেশ করলেন। সৈন্যরা সাদা পতাকা নামিয়ে সেখানে সুলতানের পতাকা উড়িয়ে দিলো।

জুরদিক কেল্লার ছোট বড় সকল কমাণ্ডারকে ডেকে হাজির করলেন সুলতান আইয়ুবীর সামনে। সুলতান বললেন, 'প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা! আমাদের জীবন, আমাদের মরণ, আমাদের সকল কাজ আল্লাহর জন্য, ইসলামের জন্য। ইসলামের পথে আছি বলেই তোমরা আমাকে বরণ করে নিয়েছো। আমিও ইসলামের স্বার্থেই তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। তোমরা দেখেছো, তোমাদের কারো কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়নি। কাউকে অস্ত্র জমা দিতেও বলা হয়নি। তার মানে হচ্ছে, কেউ তোমাদের পরাজিত করে এ কেল্লা দখল করেনি। তোমাদের সকল সৈনিককে বলে দিও, তারা যেন নিজেদেরকে পরাজিত মনে না করে। বরং ইসলামী জেহাদের প্রয়োজনে, দেশ, জাতি এবং মিল্লাতের স্বার্থে আমরা আজ পরস্পর মিলিত হয়েছি শুধু। আমরা সবাই মুসলিম ভাই ভাই। আমাদের লড়াই খৃস্টান ও তার তল্পীবাহকদের বিরুদ্ধে।'

সুলতান আইয়ুবী যে বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে বের হয়েছিলেন তার প্রথম মঞ্জিল বিনা যুদ্ধেই জয় হয়ে গেল। তিনি দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে এর শুকরিয়া আদায় করলেন। এরপর জুরদিককে নিয়ে বসলেন পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করতে।

সমস্যা দেখা দিল, জুরদিকের সৈন্যরা শীতকালে যুদ্ধ করার কোন প্রশিক্ষণ পায়নি। ঠিক হলো, হেম্মাত দুর্গকে কেন্দ্র বানিয়ে এখান থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে। জুরদিকের সৈন্যরা কেল্লায় থাকবে এবং অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করবে।

কিন্তু সৈন্যরা এ সিদ্ধান্তে ঘোর আপত্তি জানালো। তারা দাবী করলো, তারাও সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদের সাথে মিলে সরাসরি যুদ্ধে যাবে।

সামনে হেমসের দুর্গ। সুলতান আইয়ুবী এমনভাবে অভিযানের সময় নির্ধারণ করলেন, যাতে গভীর রাতে তার বাহিনী সেখানে গিয়ে পৌঁছে।

তিনি প্রথম সেনা দলকে পূর্বের মত আগে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু অন্যান্য পরিকল্পনায় কিছু কৌশলগত পরিবর্তন আনলেন। কারণ হেমসের দুর্গ বিনা যুদ্ধে জয় করতে পারবেন, তেমন কোন আশা ছিল না।

তিনি পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি টিম পাঠালেন সবার আগে। এ টীম রাস্তাতেই সংবাদ পেল, কেল্লার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে টহল বাহিনী।

যেসব দিক থেকে হেমসে সাহায্য আসতে পারে সেসব এলাকায় সুলতান আইয়ুবী ছোট ছোট কয়েকটি দলকে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, 'বাইরে থেকে কোন সাহায্য যেন হেমস দুর্গে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে

তোমাদের।'
অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও রসদ হেম্মাত দুর্গে রেখে তিনি বাকী রসদপত্র বহনের দায়িত্ব দিলেন একদল কমাণ্ডোকে। আরেকদল কমাণ্ডোকে পাঠিয়ে দিলেন রাস্তা নিরাপদ রাখতে। এদের সঙ্গী হলো হেম্মাতের এক দল সৈনিক।
সুলতান আইয়ুবী চাচ্ছিলেন, তিনি হলব পৌঁছার আগ পর্যন্ত যেন তাঁর আক্রমণের সংবাদ ওখানে না পৌঁছে। সকলের অজ্ঞাতসারে অতর্কিতে তিনি সেখানে আঘাত হানতে চান।
এ জন্য তিনি নিজের কিছু লোককে হলবের রাস্তায় ছড়িয়ে রেখেছিলেন। তাদের বলে রেখেছিলেন, আমরা যাত্রা করার পর কোন পলাতক সৈন্য বা সাধারণ লোককেও তোমাদের অতিক্রম করে হেমসে যেতে দেবে না। ওদের থামিয়ে দেবে, বেশী বাড়াবাড়ি করলে তাকে ধরে আটক করে রাখবে।

রাত অনেক গভীর। কেল্লার অধিপতি ও অফিসাররা একটা প্রশস্ত কামরায় বসে শরাব পান করছিল। দু'জন নর্তকী নাচছিল ওদের সামনে। কামরায় তবলা, সরোদ ও অন্যান্য বাজনায় সুর তুলছিল বাদক দল। কামরা ভেসে যাচ্ছিল সুসজ্জিত আলোয়।
সাধারণ সৈন্যরা নিশ্চিন্তে ডুবেছিল গভীর ঘুমে।
প্রহরীরা শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্য খোলা জায়গা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে বসে ঝিমুচ্ছিল।
বাইরে তখন কনকনে ঠাণ্ডা ও হিমেল বাতাস বইছে। তুষার

পড়ছে হাড় কাঁপানো শীতের সাথে।
পাহারাদাররা জানতো, শীতকালে যুদ্ধের কোন ভয় নেই। তাই পাহারায়ও কোন সতর্কতার দরকার মনে করতো না কেউ। কেবল রুটিন ওয়ার্ক হিসাবেই পালাবদল ঘটতো পাহারাদারের।
'আমরা এ জন্যই নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যু কামনা করতাম। দুনিয়াটাকে সে জাহান্নাম বানিয়ে ফেলেছিল। আহ্ কি আরাম! এ আরাম রেখে জান্নাতে যেতে চায় কোন্ আহাম্মক!'
দুর্গাধিপতি শরাবের পাত্র উপুড় করে বললো, 'এখন আবার সালাহউদ্দিন আইয়ুবী লম্ফঝম্ফ শুরু করেছে। খোদা যে কবে ওকে উঠিয়ে নেবেন!'
'তাঁকে আল্লাহর উঠানোর দরকার নেই, আমরাই উঠিয়ে নেবো।' এক কমাণ্ডার বললো, 'কয়টা দিন সবুর করো! শীতকালটা যেতে দাও, দেখো কি করি।'
কেল্লার প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে এক প্রহরী আরেক প্রহরীকে বললো, 'ঐ দেখো! আগুন জ্বলছে।'
'জ্বলতে দাও।' তার সাথী বললো, 'কোন কাফেলা হবে হয়ত!'
ইতিমধ্যে আগুনের তিন-চারটি গোলা শূন্যে উঠে গেলো। ওরা অবাক হয়ে দেখলো, গোলাগুলো কেল্লার দিকে ছুটে আসছে।
প্রহরীদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে ওগুলো কেল্লার ভেতর গিয়ে পড়লো। এরপর ছুটে এলো আরও গোলা। এই অগ্নি গোলার

একটা গিয়ে পড়ল কেল্লার ভেতর এক জায়গায় স্তুপ করে রাখা কাঠের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তাতে আগুন ধরে গেল।
হঠাৎ বিপদ সংকেত বেজে উঠলো, বেজে উঠলো ঘন্টাধ্বনি। কেল্লা অধিপতির আনন্দ মাহফিলে ছন্দপতন ঘটলো। হৈ চৈ ও হুলস্থূল কাণ্ড বেঁধে গেল সেখানে। সকলেই দৌড়ে গেল কেল্লার প্রাচীরের ওপর।
অকস্মাৎ ছুটে এল ঝাঁক ঝাঁক তীর। এই আকস্মিক বেপরোয়া তীর বৃষ্টিতে পড়ে হতাহত হলো বেশ ক'জন অফিসার। প্রাচীরের ওপর শোনা গেল তাদের মরণ চিৎকার।
এসময় গেটের দিক থেকে ভেসে এল গেট প্রহরীদের চিৎকার। তারা দৌড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে, 'গেটে আগুন লেগে গেছে, সুলতান আইয়ুবীর বাহিনী গেটের ওপর অগ্নি বর্ষণ করেছে, আগুনের বারুদ নিক্ষেপ করেছে, চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।'
শোরগোল ও চিৎকার শুনে দুর্গের ঘুমন্ত সৈন্যরা জেগে উঠলো। বাইরে থেকে তখনো অবিরাম তীর বৃষ্টি হচ্ছে। এ তীর বৃষ্টিতে কারো পক্ষে প্রাচীরের ওপর দাঁড়ানো অসম্ভব।
সুলতান আইয়ুবীর মিনজানিকের নিক্ষিপ্ত গোলা ও তীর কেল্লাকে জাহান্নাম বানিয়ে ফেললো। কেল্লার কমাণ্ডাররা চিৎকার করে সৈন্যদের সাহস বাড়াতে চাইল। কমাণ্ডারের ধমকে সৈন্যরা এলাপাথাড়ি তীর চালাতে লাগলো।
'অস্ত্র সমর্পণ করো।' সুলতান আইয়ুবীর বাহিনী থেকে কোন এক কমাণ্ডার উচ্চস্বরে বলে উঠলো, 'অস্ত্র সমর্পণ করো!

বাইরে থেকে তোমাদের কোন সাহায্য আসবে না! চারদিক থেকে কেল্লা আমরা ঘেরাও করে ফেলেছি। হাতিয়ার ফেলে দাও! হাতিয়ার ফেলে জীবন বাঁচাও।'

এর কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্য আইয়ুবীর সৈন্যরা সাময়িক বিরতি দিল তীর বর্ষণে। কমাণ্ডার আবার ঘোষণা করলো, 'সুলতান আইয়ুবীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করো! হাতিয়ার ছেড়ে দিলে কাউকে বন্দী করা হবে না। যাদের ইচ্ছা এখান থেকে চলে যেতে পারবে, আর যারা চাও তাদেরকে আমরা আমাদের সেনাদলে ভর্তি করে নেবো। হেম্মাত দুর্গ এখন আমাদের দখলে। ওখানকার সকল সৈন্য এখন আমাদের সাথী। চাইলে তোমরাও আমাদের সাথী হতে পারো।'

কিন্তু কেল্লার ভেতর থেকে এর কোন সাড়া মিলল না। সারা রাত থেমে থেমে তীর বর্ষণ ও ঘোষণা চলতেই থাকলো। কিন্তু কেল্লার সৈন্যরা হাতিয়ার সমর্পন করলো না।

ভোর হলো। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লে কেল্লার অধিপতি বাইরের দৃশ্য দেখলেন। দেখলেন কেল্লার প্রাচীরের ওপর তার সৈন্যদের লাশের সংখ্যা। তিনি তাড়াতাড়ি সাদা নিশান উড়িয়ে দিতে আদেশ দিলেন।

এ দুর্গও দখল হয়ে গেল। কেল্লার অধিপতি, কমাণ্ডার এবং সৈন্যরা অস্ত্র সমর্পণ করলো। সুলতান আইয়ুবী যখন কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন কেল্লার অধিপতি ও কমাণ্ডারদের শুধু এইটুকুই বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন!'

কমাণ্ডাররা বললো, 'আমরা আপনার বাহিনীতে শামিল হয়ে জেহাদে অংশ নিতে চাই।'

তিনি তাকালেন উপস্থিত কমাণ্ডার ও সৈন্যদের দিকে। বললেন, 'বন্ধুরা! তোমাদের এ আবেগকে স্বাগত জানাই। এই প্রচণ্ড শীতে যুদ্ধ করতে হলে সে জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং দরকার। আমার বাহিনী দীর্ঘদিন ট্রেনিংয়ের পর ময়দানে এসেছে। তাও সবাইকে সঙ্গে আনিনি। যখন দরকার হবে তখন তোমাদের অবশ্যই ময়দানে ডেকে নেয়া হবে। আপাততঃ তোমরা দামেশকে আমার যে বাহিনী আছে তাদের কাছে চলে যাও। ওখানে তোমাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে।'

সুলতান আইয়ুবী ওদেরকে দামেশকে পাঠিয়ে দিলেন। ওদের আনুগত্যের ব্যাপারে এখনো তিনি নিশ্চিত নন, কিন্তু এ কথা তিনি তাদের বললেন না।

এ কেল্লায় যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী মজুদ ছিল। ছিল শরাবের ছড়াছড়ি ও দু'জন নর্তকী।

সুলতানের নির্দেশে সমস্ত শরাব বাইরে ফেলে দেয়া হলো। দুই নর্তকীকে সৈন্যদের সাথে পাঠিয়ে দেয়া হলো দামেশকে। সুলতান আইয়ুবী হেমসের দুর্গকে দ্বিতীয় কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করলেন। এ কেল্লার দায়িত্বও অর্পণ করলেন হেম্মাত দুর্গের সৈন্যদের ওপর।

সামনে এখন হলবের কেল্লা ও শহর। এখান থেকে একটু

বেশী দূরে। সেখানে রয়েছে খলিফা আল মালেকুস সালেহ, তার খৃষ্টান উপদেষ্টাবৃন্দ এবং রক্ষী সেনা। হলবের পতন মানেই খৃস্টানদের এক পুতুল খলিফার পতন। খৃস্টানদের ষড়যন্ত্রের একটি অধ্যায়ের অবসান।

হেমসের মত একই পদ্ধতি গ্রহণ করলেন সুলতান এ কেল্লা ও শহর বিজয়ে। সকলের অজ্ঞাতসারে অতি গোপনে তিনি অতর্কিতে চড়াও হলেন ওখানে। চড়াও হলেন গভীর রাতে যখন ওখানকার সৈন্য ও রক্ষীরা সবাই ঘুমিয়েছিল।

দু'টি দুর্গ জয় করার পর তাঁর সেনাবাহিনীর মনোবল আরও বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। দুর্বার গতিতে তারা গিয়ে টুটে পড়লো কেল্লায়। পরদিন ভোরে তুমুল সংঘর্ষের পর তিনি হলবের কেল্লা অধিকার করতে সমর্থ হলেন।

কমাণ্ডারসহ সেখানকার পুরা সেনাদলকেও তিনি আগের মত দামেশকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

যে গোপনীয়তা এসব বিজয়কে সহজ করে দিয়েছিল সেই গোপনীয়তা আর রক্ষা করা গেল না। অস্ত্র সমর্পনকারী সৈন্যদের একজন পালিয়ে গিয়ে হলব শহরে খবর দিল, 'সুলতান আইয়ুবী হেমস ও হলব দুর্গ অধিকার করে এখন হলব শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।'

সুলতান আইয়ুবী জানতে পারেননি, তাঁর গোপনীয়তা রক্ষাকারী দলের ফাঁক গলে কেউ বেরিয়ে গেছে। তিনি সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে সেনাবাহিনীকে একটু বিশ্রামের সুযোগ দিতে চাইলেন। কারণ একটানা বিরতিহীন সফর করেছে এই

বাহিনী। প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে হেমস ও হলবের কেল্লা অবরোধ ও অধিকার করেছে। শীতের রাতে অবিরাম যুদ্ধ করে ওরা বেশ কাবু হয়ে গেছে। ওদের চাঙ্গা করার জন্য একটু বিশ্রামের এখন খুবই প্রয়োজন।

তা ছাড়া হলব শহর তো আর কেল্লা নয়। এর অবরোধ ও আক্রমণের ধরণ হবে ভিন্ন। এই ব্যবস্থা ও প্ল্যান ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

সুলতান আইয়ুবী অত্যন্ত সাবধানতার সাথে সুপরিকল্পিতভাবে এগুতে চাচ্ছিলেন। কারণ আসল যুদ্ধ তো সামনে। ওখানে মুসলিম রক্ষী ছাড়াও আছে খৃস্টান সৈন্য, তাদের গোয়েন্দা বাহিনী এবং উপদেষ্টারা।

হলব শহরে দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ল, 'সুলতান আইয়ুবী আসছেন।'

খলিফা আস সালেহ ছাড়াও ওখানকার আমীর ওমরা, রক্ষী বাহিনী ও খৃস্টান উপদেষ্টারা এ খবর শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। 'কি! সুলতান আইয়ুবী এই শীতের মধ্যেই আক্রমণ চালিয়েছে?'

কিন্তু মনে মনে একটা সান্ত্বনা তাদের ছিল, সে তো মরুভূমির যোদ্ধা, এই পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধ করে সে সুবিধা করতে পারবে না। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের মনে হলো, হলবের সৈন্যরাও তো এই এলাকায় এমন প্রচণ্ড শীতে যুদ্ধ করতে পারবে না! এই নিয়ে তারা খুব চিন্তায় পড়ে গেলো।

তারা ঠিক করলো, সুলতান আইয়ুবীকে আমাদের সুবিধা মত

ময়দানে নিয়ে যেতে হবে।
দ্বিতীয়ত, এখনি খৃস্টান সৈন্যদের খবর দিতে হবে। ইউরোপ থেকে আসা যেসব খৃস্টান সেনা রিমাণ্ডের সৈন্য বিভাগে আছে, ময়দানে নিয়ে আসতে হবে তাদের।
সুতরাং জলদি করে রিমাণ্ডের কাছে কাসেদ পাঠালো তারা। চিঠিতে লিখলো, 'সুলতান আইয়ুবী হলবের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সে হলব অবরোধ করলে তাকে পিছন থেকে আক্রমণ করতে হবে আপনার। দেরী করবেন না, হলবের সৈন্যরা বেশীক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না ওকে।'
এরপর খলিফা এবং তার সমস্ত আমীরের রক্ষী সেনাদের একত্র করলো তারা। ওদের বললো, 'সুলতান আইয়ুবী হলব শহর অবরোধ করতে আসছেন। রিমাণ্ডের কাছে এ খবর পাঠানো হয়ে গেছে। তিনি আসা অবধি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে।
রিমাণ্ডের সৈন্য এসে গেলে আর চিন্তা নেই। আইয়ুবীকে এবার উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন তিনি।'
খৃস্টান উপদেষ্টারাও গোপনীয়তা বজায় রাখার ওপর খুবই গুরুত্ব দিলেন। বললেন, 'শহরে সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা আছে। তাদের মাধ্যমে আমাদের প্রস্তুতির খবর সে জেনে ফেলতে পারে। এজন্য এখন থেকে আর কাউকে শহরের বাইরে যেতে দেয়া যাবে না।'
শহর কোতোয়াল সারা শহরে ঘোষণা করে দিল, 'এখন থেকে কেউ আর শহরের বাইরে যেতে পারবে না। কেউ এ

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বেরোবার চেষ্টা করলে তাকে কঠোর হাতে দমন করা হবে। শহরের দেয়াল টপকে কেউ পালাতে চেষ্টা করলে কোন সতর্ক সংকেত ছাড়াই তীর মেরে তাকে হত্যা করা হবে।'

একই ঘোষণা মসজিদ থেকেও বার বার প্রচার করা হলো। আরো প্রচার করা হলো, 'সুলতান আইয়ুবী সাম্রাজ্যবাদী নেশায় পাগল হয়ে তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসছে। নিজেদের জান মাল হেফাজত করার জন্য তৈরী হও সবাই। সে ইসলামী খেলাফত চায় না, খলিফার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। এই মুরতাদকে খতম করা আজ প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ হয়ে গেছে। আসুন, যার যা আছে তাই নিয়ে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই।'

খৃস্টানরা গুজব ছড়ানোয় উস্তাদ! তারা ঘরে ঘরে, অলিতে গলিতে, মসজিদে, হাটবাজারে সর্বত্র এমন সব গুজব ছড়াতে লাগলো, যাতে মানুষ তাকে ঘৃণা করতে শেখে, তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

তারা প্রচার করতে লাগলো, 'সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা যে শহরে প্রবেশ করে, সে শহরের সমস্ত যুবতী মেয়েদের একত্রিত করে তাদের শ্লীলতাহানি করে। শহরে তারা লুটতরাজ চালায়, বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। সুলতান আইয়ুবী নবুয়ত দাবী করেছে। নতুন এক ধর্ম সৃষ্টি করেছে সে, যারা তার এ ধর্ম কবুল করবে তারা কাফের হয়ে যাবে।' এমন সব উদ্ভট গুজব ছড়িয়ে তারা জনমতকে বিভ্রান্ত

করছিল।

সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির কাজ তো ছ'মাস আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। এর ফলে জনমনে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল সে ক্ষোভ এবার যুদ্ধের উন্মাদনায় গিয়ে ঠেকল। হলবের সাধারণ জনতা আইয়ুবীর আক্রমণের দাঁতভাঙা জবাব দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। যুবকরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় মহড়া দিতে লাগল।

শহরের জনগণের এই যুদ্ধ উন্মাদনা সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দাদেয় চিন্তায় ফেলে দিল। শহর থেকে বেরোনোর নিষেধাজ্ঞা নিষ্ক্রিয় করে ফেলল তাদের। সুলতানের কাছে শহরের পরিস্থিতি জানাবে তার কোন সুযোগই নেই। একদিকে সুলতানের প্রতি মানুষের প্রচণ্ড রাগ ও আক্রোশ, অন্যদিকে শহর থেকে বেরোনোর নিষেধাজ্ঞায় তারা বেশ বেকায়দায় পড়ে গেল।

এই অসহায় পরিস্থিতিতেও এক গোয়েন্দা শহর থেকে বেরোনোর কঠিন সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু শহরের দেয়াল টপকাতে যেয়ে সে সৈন্যদের তীরের আঘাতে মারা পড়ল।

গোয়েন্দা কমাণ্ডার, যিনি মশহুর আলেম হিসাবে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তিনিও সুলতানের বিরুদ্ধে প্রচারণায় শামিল হয়ে গেলেন। ফলে তিনি যে সুলতানের গোয়েন্দা এ কথা বুঝার উপায় রইল না কারো।

আস সালেহ খৃস্টানদের উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী মুশালের

শাসনকর্তা সাইফুদ্দিনকে সংবাদ পাঠালেন, তিনি যেন আস সালেহের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। হাসান বিন সাব্বাহর ফেদাইন দলের নেতা শেখ মান্নানকেও সংবাদ দেয়া হলো। তাকে বলা হলো, তিনি যে মূল্য দাবী করেন সেই মূল্যই তাকে দেয়া হবে। সুলতান আইয়ুবীকে খুন করা হোক, তাতে তার যত লোকই শেষ হয়ে যাক না কেন সে যেনো পরোয়া না করে।

শেখ মান্নান আরো একবার সুলতানকে হত্যার চেষ্টা করল। কিন্তু তার এ আক্রমণও ব্যর্থ হয়ে গেল। সুলতান আইয়ুবীর এক দেহরক্ষীকে সম্মোহিত করে এ প্রচেষ্টা চালানো হয়।

সে ব্যর্থ হলে শেখ মান্নান ফেদাইন দলের এমন একজনকে ডাকলো, জীবন ও মৃত্যু কি জিনিস তাই সে বোঝে না। যদিও সে মানুষ কিন্তু কোন মানবিক বোধ কাজ করে না তার মধ্যে। মরে যাওয়া বা কাউকে মেরে ফেলা তার কাছে খেল তামাশার ব্যাপার। বহু খুনের পলাতক আসামী সে।

শেখ মান্নান তাকে বললো, 'সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করতে পারলে তুমি যা চাও তাই পাবে।'

প্রস্তাবটি লোভনীয়। খুনী তার নয়জন সহযোগী নিয়ে রওনা হলো আইয়ুবীকে খুন করতে।

আস সালেহের দলে হিংসুটে ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে গুমাস্তগীনের বদনাম ছিল। সালেহের গভর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত ছিল এই ব্যক্তি।

প্রকাশ্যে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে থাকলেও সে আসলে বন্ধু

ছিল না কারোরই। আস সালেহকে সন্তুষ্ট করে ফায়দা লুটার জন্যই সে তার সহযোগী হয়েছিল।

খৃস্টানদের সাথেও সে বেশ ভাল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলল। এই বন্ধুত্বের প্রমাণ দেয়ার জন্য সে সালেহের কয়েদখানায় নূরুদ্দিন জঙ্গী যেসব খৃস্টানকে যুদ্ধ বন্দী হিসাবে কয়েদ করেছিল সবাইকে মুক্ত করে দিয়েছিল।

হলবে সুলতান আইয়ুবী সৈন্য নিয়ে ছুটে আসছে খবর পেয়ে সে নিজের বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো।

এ ছিল এক প্রলয়ংকরী সাইক্লোন। চারদিকে কেবল যুদ্ধের তাণ্ডব। সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শক্তি এক সাথে উঠে দাঁড়িয়েছে। এত শত্রুর মোকাবেলা করা কোন চাট্টিখানি কথা নয়!

গোয়েন্দা বিভাগ অকেজো হয়ে যাওয়ায় সুলতান হলব শহরের কোন সংবাদই পাচ্ছিলেন না। জানতে পারছিলেন না তার বিরুদ্ধে শত্রু শিবিরে কি হচ্ছে। কিন্তু তবু তিনি খুব বেশী বিচলিত হননি। মোটামুটি সন্তুষ্ট চিত্তেই পরবর্তী অভিযানের পরিকল্পনা করে যাচ্ছিলেন।

তখন পর্যন্ত তার ধারণা ছিল, হলববাসীর অজ্ঞাতেই সেখানে তিনি আঘাত হানতে সক্ষম হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার এ ধারনা আর টেকেনি। সাধারণ আকারের যুদ্ধের পরিবর্তে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন তিনি।

কিছুটা বিশ্রাম ও অবকাশের পর মুজাহিদরা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। সৈন্যদের নিয়ে হলব শহরের দিকে যাত্রা করলেন

তিনি।
যত কম সম্ভব সৈন্য ক্ষয় করে বিজয় ছিনিয়ে আনা ছিল তার টার্গেট। এ জন্য আগের মতই সৈন্য চালনা করলেন তিনি। সাবধানে এগিয়ে যেতে বললেন প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলকে।
কমাণ্ডোরা আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিল, এবার সসৈন্যে তিনি এগিয়ে চললেন হলবের পথে।
সামনে কংকরময় পাহাড়ী এলাকা। উঁচু নিচু টিলার ফাঁক দিয়ে রাস্তা। মাঝারী একটি নদী বয়ে গেছে পাশ দিয়ে। নদীপারের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন আইয়ুবী।

১১৭৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাস। শীতের তীব্রতা বেড়ে গেছে আরও। সুলতান আইয়ুবীর সাথে ময়দানে আছে তার এক চতুর্থাংশ সৈন্য। তিন ভাগই রয়ে গেছে রিজার্ভ বাহিনীতে। দামেশকে বসেই ওরা আইয়ুবীর অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের খবর পাচ্ছিল। এই বিজয়াভিযানে সরাসরি অংশ নিতে পারেনি বলে আফসোসের সীমা ছিল না তাদের। তারা উন্মুখ হয়ে বসেছিল, যদি ডাক আসে!
নদী পার হতে যাবেন আইয়ুবী, দেখলেন অগ্রগামী বাহিনী অগ্রযাত্রা মুলতবী রেখে পাহাড়ের আড়ালে অবস্থান নিয়ে আছে। এক গোয়েন্দা এসে খবর দিল, 'নদীর ওপারে পাহাড়ের কয়েকটি টিলা পেরোলেই রয়েছে এক বিস্তৃত নিম্নাঞ্চল। কিভাবে খবর পেয়েছে জানিনা, কিন্তু সেখানে

একদল শত্রু সেনা ওঁৎ পেতে বসে আছে।'
সুলতান চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি আসবেন এটা তো তাদের জানার কথা নয়! তাহলে এটা হলো কি করে? কেমন করে হলববাসী খবর পেলো এই আগমনের?
তিনি তাড়াতাড়ি তার বাহিনীকেও পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে বললেন। যতটা সম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে গেল কাফেলা। দূর থেকে তাকালে শূন্য টিলা ছাড়া আর কিছুই দেখার উপায় নেই। এতবড় একটা সেনাবাহিনী লুকিয়ে আছে বুঝার কোন উপায় নেই বাইরে থেকে।
শীতকাল। নদীতে পানি বেশী নেই। স্থানে স্থানে বড় বড় পাথর মাথা তুলে আছে পানির ওপর। মানুষ ও ঘোড়া অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে ওই পানি ভেঙ্গে।
নদী পার হওয়াটা কোন সমস্যা ছিল না, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল সামনে শত্রুর অবস্থান। ভাবতে লাগলেন সুলতান। একবার ভাবলেন, এখান দিয়ে নদী পার না হয়ে অন্য কোন দিক দিয়ে পার হয়ে যাবেন। গোয়েন্দাকে বললেন, এরকম কোন জায়গা খুঁজে বের করো। গোয়েন্দা ঘুরে ফিরে এসে খবর দিল, 'আশপাশে এরকম কোন জায়গা নেই। খাঁড়া পাহাড় ডিঙিয়ে বরফ ভেঙে ওপারে গিয়ে উঠার মত সুবিধাজনক কোন জায়গা খুঁজে পেলাম না।'
অগত্যা আইয়ুবী সিদ্ধান্ত নিলেন, ওদের সাথে একটা বোঝাপড়া করেই সামনে এগুবেন তিনি।
খুব তাড়াতাড়িই শীতের রাত নেমে এল। সুলতানের বাহিনীর

কোন সাড়াশব্দ নেই। চুপচাপ প্রহর গুণছে দুশমন কাফেলাও। অনেক রাতে ফিরে এল আইয়ুবীর এক গোয়েন্দা। বললো, 'টিলার ওপাশে দুশমন বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছু প্রহরী পাহারায় থাকলেও তাদের মধ্যে কোন উত্তেজনা বা টান টান ভাব নেই। গা-ছাড়া ভাবে এদিক-ওদিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে অল্প ক'জন সৈন্য।'

তিনি সেই গোয়েন্দার সাথে একদল কমাণ্ডো বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। শত্রু সৈন্যরা বেশ শান্তিতেই ছিল। এমন তুষার রাতে কারো দ্বারা তারা আক্রান্ত হবে, এ কথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

এখন মধ্য রাত। খোলা মাঠে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। শত্রু সেনারা ক্যাম্পের ভেতর গভীর ঘুমে অচেতন। কমাণ্ডারও ঘুমে বিভোর। রাতজাগা প্রহরীরা জুবুথুবু হয়ে গরম কাপড়ে নাক মুখ ঢেকে শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে।

এক প্রহরী শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছিল। পিছন থেকে কে যেন তার গলা পেঁচিয়ে ধরলো। সে কিছু বুঝে উঠার আগেই অন্য একজন চ্যাংদোলা করে উঠিয়ে নিল তাকে। তখনো সে বুঝতে পারেনি, আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনীর পাল্লায় পড়েছে সে।

একটু তফাতে এনে ওরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের ঘোড়াগুলো কোথায়?'

তার বুকে তলোয়ারের মাথা ঠেকানো। প্রহরী জানতো, যে

কোন সময় সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা এসে পড়তে পারে। সে বুঝতে পারলো, আইয়ুবীর সৈন্যদের পাল্লায় পড়ে গেছে সে।

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল তার। মিনমিন করে সে বললো, 'ভাই, আমিও তোমাদের মত মুসলমান। আমাকে মেরো না। এটা রাজা বাদশাহর বিবাদ! আমরা শুধু শুধু কেন একে অন্যের রক্ত ঝরাবো!'

'ভয় নেই, তোমাকে আমরা মারবো না। তবে বাঁচতে চাইলে তোমাকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। বলো, তোমাদের ঘোড়াগুলো কোথায়?'

সে বললো, 'ঘোড়া এক জায়গায় বাঁধা নেই। কখন আইয়ুবীর সৈন্যরা এসে পড়ে এই ভয়ে সৈন্যদের সাথেই আছে ঘোড়াগুলো। প্রত্যেক তাবুর পাশেই সৈন্যরা নিজ নিজ ঘোড়া বেঁধে রেখেছে।'

কমাণ্ডোরা তাকে নিয়ে গেল তাবুর পাশে। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের কমাণ্ডার কোন তাবুতে?'

সে কমাণ্ডারের তাবু দেখিয়ে দিল। ওরা তাকে পিছনে সরিয়ে নিয়ে এসে বললো, 'এবার এখানে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখো।'

সৈন্যদের তাবু থেকে সামান্য দূরে ওরা ছোট আকারের একটা মেনজানিক স্থাপন করলো। এরপর কমাণ্ডোরা তাতে গোলা ভরে ছুঁড়ে দিল ক্যাম্পের দিকে। প্রথম গোলা ক্যাম্পে আঘাত হানার সাথে সাথেই দ্বিতীয় গোলা নিক্ষেপ করলো।

জ্বলন্ত অগ্নিগোলা ক্যাম্পে আঘাত হানতেই আগুন ধরে গেল

তাতে। প্রহরীরা 'কে এলো! কে এলো!' চিৎকার শুরু করে দিল।

এই অগ্নি গোলাগুলো ছিল বিশেষ ধরনের। একটি হাড়িতে পেট্রোল ভেজা ছোট ছোট কাপড়ের টুকরা ভরে গোলার সাথে ছুঁড়ে মারা হতো। মাটিতে পড়েই হাড়ি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো আর কাপড়ের টুকরোগুলোয় আগুন ধরে ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে।

বিভিন্ন তাবুতে আগুন ধরে গিয়েছিল। বাতাসের তোড়ে সে আগুন আরও বিস্তার লাভ করতে লাগলো।

ঘুমন্ত সৈনিকরা জেগে উঠল। ক্যাম্পে শোরগোল ও দৌড়াদৌড়ির হুলুস্থুল পড়ে গেল।

ঘোড়াগুলো দড়ি ছিঁড়ে ছুটতে লাগল দিগ্বিদিক। সেই দড়িতে পেঁচিয়ে এবং খুরের আঘাতে আগুনজ্বলা কাপড়গুলো এদিক ওদিক ছিটকে পড়তে লাগল। ফলে অক্ষত তাবুগুলোতেও আগুন ধরে গেল।

সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো।

এ সময়ের জন্যই অপেক্ষা করছিল কমাণ্ডো বাহিনী। ওরা বেপরোয়া তীর চালাতে শুরু করলো। আহত সৈন্যদের আর্তচিৎকারে নরক গুলজার হয়ে গেল ক্যাম্পের পরিবেশ।

দীর্ঘ প্রায় এক মাইল জুড়ে ক্যাম্প করে সুলতানের বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করছিল এ ফৌজ।

প্রথম গোলাতেই আক্রান্ত হয়েছিল কমাণ্ডারের তাবু। তিনি

ছুটে বাইরে এসেই বুঝতে পারলেন সুলতানের বাহিনীর তোপের মুখে পড়ে গেছেন তিনি এবং তার বাহিনী।

তিনি কাউকে কিছু না বলে ছুটে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেলেন। ওখানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন কমাণ্ডো বাহিনীর ধ্বংসলীলা এবং নিজের বাহিনীর শোচনীয় পরিণতি।

সকাল হলো। আবছা অন্ধকারে ঢাকা ক্যাম্প। কমাণ্ডোরা ফিরে গেছে একটু আগে। থিতিয়ে আসছে চিৎকার, চেঁচামেচি। এখানে ওখানে এখনো জ্বলছে আগুন। ক্যাম্পে ফিরে এলো কমাণ্ডার।

নিজের বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা দেখে হাহাকার করে উঠল তার বুক। কমাণ্ডোদের তীর বর্ষণে যে পরিমাণ সৈন্য মারা গেছে, ঘোড়ার পায়ের তলে পিষ্ট হয়ে মারা গেছে তারচে অনেক বেশী।

কমাণ্ডারের মত আরো অনেকেই প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল। একে একে তারাও ফিরে আসতে লাগলো ক্যাম্পে। ওদের নিয়ে কমাণ্ডার লাশ এবং আহতদের আলাদা করতে লেগে গেল।

একদল লেগে গেল আহতদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাজে। শীত-সকালে কোমল রোদের উষ্ণতা ভোগ করার মত সময় বা মানসিকতা ছিল না কারোরই। তখনো ওরা ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাজ শেষ করেনি, সহসা একদিক থেকে ভেসে এলো 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি।

ওরা হাতিয়ার বের করার আগেই ওদের ওপর নেমে এলো

কিয়ামতের প্রলয়। কিন্তু এবার আর কমাণ্ডো বাহিনী ছিল না, স্বয়ং সুলতান আইয়ুবীর সেনাদল হামলে পড়েছিল ওদের ওপর।

এমনিতেই রাতের কমাণ্ডো বাহিনীর আক্রমণে নাস্তানাবুদ হয়ে গিয়েছিল ওরা, আইয়ুবীর এ আক্রমণ মরার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে দেখা দিল। অগণিত লাশ আর আহতদের পিছু ফেলে পালাতে লাগলো ওরা।

সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'তোমরা কাফেরদের বন্ধু! আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। তোমাদের প্রলয় দেখো! তোমাদের ওপর আল্লাহর গজব নেমে এসেছে।'

শত্রু সেনারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অনেকে পিছু হটে নদী পার হয়ে গেল। অনেকে পাহাড়ের গর্তে গিয়ে আত্মগোপন করলো।

সুলতান আইয়ুবী সৈন্যদের বলে রেখেছিলেন, তারা যেন পলাতকদের পিছু ধাওয়া করে নদী পার না হয়। তিনি তাদের ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে ভীতির বিভীষিকা ছড়াতে চাচ্ছিলেন। তার উদ্দেশ্য সফল হলো। কেয়ামতের প্রলয় দেখে পালালো দুশমন।

যারা পালানোর সুযোগ পেল না তারা অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য হলো। আইয়ুবীর সৈন্যরা লুকিয়ে থাকা সৈন্যদের খুঁজে বের করে তাদেরও অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করলো। দেখা গেল, লড়াইয়ে প্রতিরোধকারীর চাইতে অস্ত্র সমর্পণকারীদের

সংখ্যাই বেশী।
আইয়ুবী এক উঁচু টিলার ওপরে উঠে ময়দানের দৃশ্য দেখলেন। আনন্দ লাভের চেয়ে তাঁর চেহারায় দেখা গেল বিষণ্নতার ছায়া।
'এ দৃশ্য দেখে খোদাও হয়ত বিষণ্ন হবেন।' সুলতান আইয়ুবী তার পাশে দাঁড়ানো অফিসারকে বললেন, 'দু'দিকেই কাদের রক্ত স্রোত বয়ে যাচ্ছে? মুসলমানদের। এই হলো ইসলামের অবক্ষয়ের নিদর্শন! যদি মুসলমান এখনও সতর্ক না হয়, তবে কাফেররা এভাবেই মুসলমানদেরকে পরষ্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে নিঃশেষ করে দেবে।'
অফিসাররাও প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অগণিত লাশের দিকে তাকিয়েছিল। সে চোখগুলোতে ছিল অপরিসীম বেদনা ও শোকের আর্তি। সুলতান তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'হে আমার সুখ দুঃখের সাথী ও ভাইয়েরা! তোমাদের কি মনে হয় আমি অন্যায় করছি, ন্যায়ের পথে নেই? যদি বলো তো আমি আমার তলোয়ার আস সালেহের পদতলে রেখে দেই!'
'না সুলতান! আপনি ঠিক পথেই আছেন। এই যে দেখছেন এতগুলো লাশ, এ লাশগুলো আমাদের ভাইদের। ওদের খুন করেছে আস সালেহের ক্ষমতার মোহ, তার অপরিনামদর্শী চিন্তা ও কাফেরদের ষড়যন্ত্র, আপনি নন।'
অপরজন বললো, 'আমাদের অন্তর সাক্ষী, আমরা হকের ওপরেই আছি! মন থেকে সব ওয়াসওয়াসা দূর করুন। এই

ষড়যন্ত্রের মূল উৎপাটন করে বাঁচাতে হবে জাতিকে, বাঁচাতে হবে ষড়যন্ত্রের শিকার এইসব ভাইদের, রক্ষা করতে হবে আমাদের ঈমান আমল।'

হলব শহরের প্রতিটি মানুষ আগুনের শিখার মত উত্তেজিত হয়ে ছিল। সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা নদী পার হয়ে এগিয়ে চললো হলবের দিকে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল হলব শহরের প্রাসাদের চূড়া।

সুলতান আইয়ুবী তাকিয়ে ছিলেন সেদিকে। তার বিস্তৃতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মনে মনে খতিয়ে দেখছিলেন। ভাবছিলেন, শহরটা কি অবরোধ করবেন, না সরাসরি প্রবেশের জন্য ঝটিকা আক্রমণ চালাবেন।

তিনি তখনও শহরের ভেতরে মানুষে মনের আবেগ ও উত্তেজনার কথা জানতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, শহরের সবাই যেহেতু মুসলমান, দু'পক্ষেরই সমর্থক থাকবে সেখানে। এ চিন্তা থেকেই তিনি এমন পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী হলেন, যাতে দুটো পদ্ধতি এক সাথেই কাজে লাগানো যায়। তিনি তার বাহিনী দুই ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগকে অবরোধের নির্দেশ দিয়ে অন্য দল নিয়ে অগ্রসর হলেন সামনে।

যুদ্ধের শুরু হলো তীর বিনিময়ের মাধ্যমে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনি অনুভব করলেন, তার বাহিনী পিছু সরে আসছে।

হলব শহরের একদিক থেকে কমপক্ষে দুই হাজার অশ্বারোহী বাহিনী বেরিয়ে এলো। বেরিয়েই তারা সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর এক পাশে আক্রমণ চালালো।

তাদের গতি ছিল খুব ক্ষিপ্র এবং আক্রমণ ছিল বীরত্বপূর্ণ। সুলতান আইয়ুবী ভেবে পেলেন না, ওরা এতটা বেপরোয়া হওয়ার সাহস পেল কি করে?

অশ্বারোহী বাহিনীর পেছন পেছন বেরিয়ে এল পদাতিক বাহিনী। অশ্বারোহী দল পদাতিক সৈন্যদের আক্রমণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেল পদাতিক বাহিনী।

কিন্তু সুবিধা করতে পারলো না ওরা। ঘোড়সওয়ারের সাথে লড়তে গিয়ে অনেকেই অশ্ব পদতলে পিশে গেল।

অবস্থা বেগতিক দেখে শহরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো নতুন আরেকটি দল। এ দল পদাতিক ও অশ্বারোহীদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। তাদের অগ্রযাত্রার সুযোগ করে দিল শহরের বিভিন্ন প্রাসাদের উঁচু জায়গা থেকে ছুটে আসা তীর।

তীরন্দাজদের সহায়তায় এ দলটি সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর কাছাকাছি চলে এলো এবং অদ্ভুত ক্ষীপ্রতার সাথে ঢুকে পড়লো আইয়ুবীর বাহিনীর অভ্যন্তরে। মুহূর্তে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংঘাত বেঁধে গেল হলবের ময়দানে।

একদিকে স্বয়ং আইয়ুবীর নেতৃত্বে জান কবুল মুজাহিদ বাহিনী, অন্যদিকে খৃস্টান উপদেষ্টাদের মদদ ও পরিকল্পনায় পরিচালিত খলিফা আস সালেহের রক্ষী বাহিনী।

লড়াইয়ের এ ডামাডোলের মধ্যে সুলতান আইয়ুবীর দুই গোয়েন্দা প্রহরীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে

এলো। বেরিয়েই ওরা সুলতানকে খুঁজতে লাগলো এবং এক সময় তাকে পেয়েও গেল।

সুলতানকে দেখতে পেয়েই তারা ছুটে গেল তার কাছে। বললো, 'মাননীয় সুলতান! শহরের জনমতকে তারা আপনার বিরুদ্ধে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছে যে, শহরের প্রতিরক্ষায় এখন কোন সৈন্যের দরকার নেই, ক্ষিপ্ত জনতাই মরণপণ করে প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

সুলতান আইয়ুবী আগে থেকেই জানতেন, হলববাসী তার ওপর ক্ষিপ্ত। কিন্তু তারা যে এমন পাগলপারা হয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে, এতটা ভাবতে পারেননি।

এ খবরে তিনি যেমন চিন্তিত হলেন তারচে বেশী অভিভূত হলেন তাদের এই বীরোচিত ভূমিকায়। আফসোস করে বলতে লাগলেন, 'হায়! মুসলমানদের এই আবেগ উচ্ছ্বাস ও বীরত্ব প্রদর্শন করার কথা ছিল কাফেরদের বিরুদ্ধে, কিন্তু আফসোস! ষড়যন্ত্রের জালে পড়ে আজ তারা ভাইদের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছে।'

সুলতান আইয়ুবী তাঁর বাহিনীকে পিছনে সরিয়ে নিলেন। এক সহকারী এগিয়ে এসে বললো, 'সুলতান, শহরে মেনজানিক নিক্ষেপ করার অনুমতি দিন।'

সুলতান আইয়ুবী এই পরামর্শ অস্বীকার করে বললেন, 'ওতে শুধু শুধু শহরবাসীর বাড়ী-ঘর ধ্বংস হবে; নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা মারা যাবে। এ কথা চিন্তা করেই আমি কমাণ্ডো বাহিনী পাঠাইনি। এ শহর যদি খৃস্টানদের হতো, তবে তা এতক্ষণে

আগুনের শিখার নিচে থাকতো। আমার কমাণ্ডো বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকতো এ শহর।
যে মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দানে এসে এখন লড়ছে ও মরছে, এদের সাধ্য হতো না আমার কমাণ্ডো বাহিনীকে বাঁধা দেয়। যারা ঘরে বসে আছে তাদেরকে আমি মারতে চাই না।'
সুলতান আইয়ুবী তার বাহিনীকে সংহত করে অবরোধকারী বাহিনীর সাথে শামিল হলেন এবং বললেন, 'শুধু প্রতিরক্ষার জন্যই লড়াই করতে হবে, আক্রমণ করার জন্য নয়। আক্রান্ত হলে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে এবং নিজেদের হেফাজত করে অবরোধ দৃঢ় করতে হবে। আমাদের সৈন্য সংখ্যা কম, এ জন্য অযথা সৈন্যক্ষয়ের ঝুঁকি যেমন নিতে চাই না, তেমনি এ শহর ধ্বংস হয়ে যাক, তাও আমি চাই না।'

১১৭৫ খৃস্টাব্দের পূর্ণ জানুয়ারী মাস শহরটি অবরুদ্ধ অবস্থায় রইল। হলবের সৈন্যরা একের পর এক আক্রমণ চালালো অবরোধ মুক্ত করতে কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে যেতে হলো তাদের। সুলতান আইয়ুবী তাদের প্রতিটি আঘাতই শক্ত হাতে ফিরিয়ে দিলেন কিন্তু একবারের জন্যও শহর দখল করার জন্য আক্রমণ চালালেন না।
১১৭৫ খৃস্টাব্দের পহেলা ফেব্রুয়ারী। সুলতান আইয়ুবীর কাছে খবর এলো, ত্রিপোলীর খৃস্টান শাসক রিমাণ্ড হলবের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। বলা হলো, 'সম্রাট রিমাণ্ড বিশাল পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেছেন।'

আস সালেহের সহযোগিতায় রিমাণ্ড এগিয়ে আসবে, জানতেন সুলতান। এ খবরের জন্য মনে মনে তিনি অপেক্ষায় ছিলেন। রিমাণ্ডের মোকাবেলার জন্য তিনি পরিকল্পনা করেই রেখেছিলেন। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে এবার মনযোগ দিলেন তিনি।

সংরক্ষিত সৈন্যদের একটি দলকে তিনি এমন জায়গায় রেখে দিয়েছিলেন, যেখান থেকে রিমাণ্ডকে স্বাগত জানানোর জন্য খুব বেশী দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না।

এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই এক কাসেদকে পাঠিয়ে দিলেন সেই রক্ষিত বাহিনীর কাছে। তাকে বলে দিলেন, 'যত শিগগির সম্ভব ওদের বলবে, রিমাণ্ডের আসার পথের পাশে উঁচু জায়গায় তীরন্দাজদের বসিয়ে রাখতে। তাদের পেছনে থাকবে অশ্বারোহী বাহিনী। আমি আসছি।

যদি খৃস্টান বাহিনী আমার আগেই পৌঁছে যায়, তবে সম্মুখ যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে ওদের ওপর কমাণ্ডো আক্রমণ চালাতে বলবে। যতক্ষণ ওরা নির্দিষ্ট জায়গায় না পৌঁছে ততক্ষণ ওঁৎ পেতে বসে থাকতে বলবে ওদের।

রাস্তার দু'পাশের প্রতিটি পাহাড় চূড়া যেন কমান্ডোদের দখলে থাকে। ওরা দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় পুরোপুরি প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত আক্রমণ করতে নিষেধ করবে।

অশ্বারোহী বাহিনী যেন তাদের পেছনে ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দেয়। কোন অবস্থাতেই ওদের পিছু হটতে দেবে না। প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে আসুক তাতে অসুবিধা নেই।'

সুলতান ওকে বলে দিলেন কোন পাহাড়ের আড়ালে অবস্থান নেবে এই বাহিনী। কাসেদ সুলতানের নির্দেশ নিয়ে দ্রুত রওনা হয়ে গেল নির্দিষ্ট গন্তব্য পথে।

'আর রিস্তান' এক দুর্গম পার্বত্য এলাকার নাম। রিমাণ্ডকে হলব পৌঁছতে হলে এ পথ তাকে অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে।

রিমাণ্ড তার অভিযানের প্ল্যান করলো এভাবে, প্রথমে তিনি হেম্মাত পর্যন্ত যাবেন। সেখানে সুলতান আইয়ুবী নেই, অতএব এ দুর্গ পূনরুদ্ধার করা খুব কঠিন হবে না। কারণ সুলতানের বাহিনী এখন হলবের ময়দানে। এতে পেছন থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয় দূর হবে এবং এ দুর্গ থেকে রসদপত্রের যোগান বন্ধ হয়ে যাবে সুলতানের।

আর যদি এ খবর পেয়ে সুলতান এগিয়ে আসে তা পুনরুদ্ধার করতে, তবে আস সালেহের বাহিনী তার পিছু ধাওয়া করতে পারবে। এমনটি হলে মরুভূমিতেই দুই বাহিনীর মাঝে ফেলে সুলতানকে পিষে মারা যাবে।

রিমাণ্ডের এগিয়ে আসার খবর পাওয়ার পরের রাত। আকাশে চাঁদ নেই। চারদিকে কুয়াশা ও হিমেল বাতাসের সাথে মিতালি পাতিয়ে ছুটে এসেছে ঘন অন্ধকার। এ অন্ধকারের মাঝেই অবরোধ তুলে নিলেন সুলতান। কিন্তু সৈন্যদের তাবু গুটাতে নিষেধ করলেন। তাবুর মত পড়ে রইল তাবু, সৈন্যরা সওয়ার হয়ে গেল ঘোড়ায়। ছুটলো রিমাণ্ডের এগিয়ে আসা বাহিনীর মোকাবেলা করতে। নদী পেরিয়ে পাহাড়ের আড়ালে

একদল সৈন্যকে লুকিয়ে রেখে বাকি সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গেলেন সুলতান।
ভোরে হলবের রক্ষীরা দূর থেকে তাকিয়ে দেখলো সুলতানের তাবুগুলো আগের মতই অনড় আছে।
বার বার আঘাত হেনে ক্লান্ত রক্ষীরা অপেক্ষা করছিল রিমাণ্ডের আগমনের। অযথা শক্তি ক্ষয় না করে রিমাণ্ড আসা পর্যন্ত হামলা মুলতবী রাখার জন্য বললো খৃস্টান উপদেষ্টাবৃন্দ। এ সিদ্ধান্তে খুশীই হলো হলবের রক্ষী ও সৈন্যরা।

'আর রিস্তান' চলে এসেছে রিমাণ্ড। পাহাড়ের ওপরে বরফের আস্তর দেখে খুশীই হলেন তিনি। সুলতান আইয়ুবীর মরু শেয়ালরা এই বরফের রাজ্যে থাকতে থাকতে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে আছে। ইউরোপের চৌকস খৃস্টান সেনাদলের সাথে যুদ্ধ করার মত অবস্থায় নিশ্চয়ই নেই তারা। মনে মনে বেশ পুলক অনুভব করলেন রিমাণ্ড।
সুলতান আইয়ুবী এসে পৌঁছলেন আর রিস্তান অঞ্চলে। তার আগেই ওঁৎ পেতে থাকা তীরন্দাজরা পাহাড়ের চূড়া থেকে তীর বর্ষণ শুরু করলো রিমাণ্ডের বাহিনীর ওপর।
এই আকস্মিক ও অতর্কিত হামলায় রিমাণ্ড বিস্মিত ও শংকিত হলো। পরিস্থিতি কতটা নাজুক হতে পারে এবং হামলাকারীরা কি পরিমাণ শক্তিশালী কিছুই জানা নেই তার। তাই রিমাণ্ড আপাতত মোকাবেলার চিন্তা বাদ দিলেন।
যুদ্ধ না করে সৈন্যদের তিনি সরিয়ে নিতে চাইলেন নিরাপদ

আশ্রয়ে। কিন্তু যেদিকেই আশ্রয় নিতে যায় সেদিক থেকেই ছুটে আসে তীর। রিমাণ্ডের বাহিনী প্রতি পদক্ষেপে লুকানো বিপদের সম্মুখীন হচ্ছিল।

রিমাণ্ড অভিজ্ঞ সেনাপতি। বুঝলেন, যতক্ষণ এখানে থাকবেন ততক্ষণই লোক ক্ষয় হতে থাকবে তার। অদৃশ্য শত্রুকে তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

তিনি সামনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। বাহিনী অনুসরণ করলো তাকে। যতদূর সম্ভব ঢাল দিয়ে তীরের আঘাত ঠেকিয়ে অনেক দূর এগুনোর পর রিমাণ্ড অনুভব করলো এখন আর তীর আসছে না।

তিনি রাস্তা থেকে সরে এক পাহাড়ের কোলে গিয়ে ক্যাম্প করলেন।

তীরের আঘাতে যারা ধরাশায়ী হয়েছে তাদের লাশগুলো পড়ে রইল পথের ওপর। আহতদের সেবায় লেগে গেল চিকিৎসকরা। বাকীরা তাবু টানিয়ে বিশ্রামে গেল।

শেষ রাতের দিকে শুরু হলো শীতকালীন বর্ষণ। নিচু জায়গায় তাবু টানিয়েছিল ওরা। তাবুর ভেতর গড়িয়ে এসে পানি ঢুকতে শুরু করলো। সৈন্যরা তাড়াতাড়ি তাবু গুটিয়ে সুবিধামত উঁচু জায়গায় তাবু খাটাল আবার।

নতুন করে যাত্রা শুরু করার আগে রসদবাহী কাফেলার জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন রিমাণ্ড। দু'এক দিনের মধ্যেই চলে আসার কথা ওদের। চার পাঁচ দিন কেটে গেল, কিন্তু রসদবাহী কাফেলার কোন দেখা নেই।

এদিকে ঘোড়ার শুকনো খোরাক শেষ হয়ে গেল, সৈন্যদেরও রসদের প্রয়োজন দেখা দিল। তবে তাদের সাথে খাবার যথেষ্টই ছিল, খাদ্য নিয়ে কোন দুশ্চিন্তায় পড়ল না ওরা।

তিনি এক কাসেদকে পাঠালেন খবর কি দেখে আসার জন্য। সে ফেরত এসে সংবাদ দিল, 'সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে।'

রিমাণ্ড খুব আশ্চর্য হলো, সুলতান আইয়ুবী এত তাড়াতাড়ি এখানে এলো কেমন করে? তিনি তার দু'জন অফিসারকে পাঠালেন পরিস্থিতি দেখে আসতে। বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। তোমাদের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।'

অফিসাররা ফিরে এলো পরদিন। বললো, 'ঘটনা সত্যি, সুলতানের সৈন্যরা রসদ আমদানীর রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে।'

তারা তখনো রিমাণ্ডের তাবু ত্যাগ করেনি, এক কাসেদ এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো সামনে।

'বলো, কি খবর নিয়ে এসেছো তুমি?'

'মহামান্য সম্রাট, আইয়ুবী হলবের অবরোধ উঠিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছেন।'

'এর অর্থ হলো, আমার দায়িত্ব শেষ। হলব অবরোধ মুক্ত করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আমাকে। হলব এখন মুক্ত, চলো এবার ত্রিপোলী ফিরে যাই।'

রিমাণ্ড অফিসারদের বললেন, 'সৈন্যদের তাবু গুটাতে বলো। এখানে অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। সামনে এগোনোরও

দরকার নেই। সৈন্যদের বলো, আমরা এখন ত্রিপোলী ফিরে যাবো।'

সুলতান আইয়ুবীর যখন শোনলেন রিমাণ্ড যুদ্ধ ছাড়াই ত্রিপোলী ফিরে যাচ্ছেন, তখন তিনি খুব অবাক হলেন। রিমাণ্ডকে ফিরে যেতে হলে সেই দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল অতিক্রম করতেই হবে। এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।
কিন্তু রিমাণ্ড সে রাস্তা আর মাড়াতে চান না। সুলতান আইয়ুবীর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাক, আর আইয়ুবী তার বাহিনী তছনছ করুক এটা তিনি কিছুতেই হতে দিতে পারেন না। তিনি আইয়ুবীর সাথে মোকাবেলার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে বিকল্প পথে ফিরে যেতে চাইলেন।
অফিসাররা বললো, 'কিন্তু বিকল্প কোন পথ তো নেই!'
রিমাণ্ড বললেন, 'তাহলে আমরা প্রয়োজনে পাহাড় ডিঙিয়ে সেই পথ অতিক্রম করবো, যেখানে আইয়ুবী আমাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে। কোন অবস্থাতেই আমি আইয়ুবীর সামনে পড়তে চাই না।'
ঐতিহাসিকরা বলেছেন, কয়েকটি কারণে রিমাণ্ড খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তার ধারনা মিথ্যা প্রমাণ করে মরুভূমির মত বরফের রাজ্যেও মুসলমানদেরকে স্বচ্ছন্দভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি। এরপর তিনি রওনা দেয়ার সাথে সাথে সুলতানের খবর পেয়ে যাওয়া এবং তার চাইতে দ্রুতগতিতে ছুটে এসে এই পার্বত্য

এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে তার বাহিনীকে আক্রমণ, প্রচণ্ড শীত ও বরফ উপেক্ষা করে তার রসদপত্র আমদানীর রাস্তা বন্ধ করে দেয়ার ঘটনায় তার মনোবল ভেঙে পড়েছিল। কেউ কেউ আরো একটি কারণ উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, তিনি আস সালেহ ও তার আমীরদের ধোঁকা দিতে চাচ্ছিলেন এবং এই ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে বাস্তবে তাই করলেন।

ঐতিহাসিকরা আরো লিখেছেন, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রিমাণ্ডের রাজধানী ত্রিপোলী আক্রমণ করতে পারে এই ভয়ে তিনি দ্রুত সসৈন্যে রাজধানী ফিরে গিয়েছিলেন।

তিনি প্রচুর অর্থ সম্পদের বিনিময়ে আস সালেহকে সাহায্য করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এ জন্যই তিনি খলিফার আমন্ত্রণে যুদ্ধ যাত্রায় বাধ্য হয়েছিলেন। সুলতান অবরোধ তুলে নিয়েছেন এ খবরে তাই তিনি স্বস্তি বোধ করে বলেছিলেন, 'এখন আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই।'

মুসলমানরা পরস্পর যুদ্ধ করে নিঃশেষ হয়ে গেলে তার তো কোন ক্ষতি নেই! বরং লাভ আছে। যে সৈন্যদের হত্যা করার জন্য অস্ত্র ধরতে হতো তাকে, সে সৈন্যরা আজ নিজেরা নিজেরা মারামারি করে মরছে, এরচে খুশীর খবর তার জন্য আর কি হতে পারে!

তিনি দ্রুত আস সালেহের কাছে এক দূত পাঠালেন। পত্রে তিনি লিখলেন,

'খলিফা আস সালেহ,

আমি ওয়াদা করেছিলাম, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আপনাকে

আক্রমণ করলে আমি আপনার পাশে দাঁড়াবো। অবরোধের খবর পেয়ে আমি নিজেই সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য নিয়ে আপনার সাহায্যে ছুটে এলাম। আমার অগ্রযাত্রার খবর পেয়েই সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী হলবের অবরোধ তুলে পালিয়ে গেল।
আমি খুশী যে, আমি আমার ওয়াদা যথাযথভাবে পূরণ করতে পেরেছি। এই অবরোধ মুক্ত করার পর আমার সঙ্গে আপনার যে সামরিক ওয়াদা ও চুক্তি ছিল সেটা শেষ হয়ে গেল।
আপনার কাছ থেকে অগ্রিম হিসাবে যে সোনা ও অর্থ পেয়েছিলাম তার হক আমি পুরোপুরি আদায় করেছি। এবার আপনার ওখানে আমার যে সামরিক উপদেষ্টা ও প্রতিনিধিরা আছে তাদের অতি সত্তর পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। আপনার সাফল্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।'

সম্রাট রিমাণ্ড, ত্রিপোলী।

আস সালেহ ও তার আমীররা এই চিঠি পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।
'খৃস্টানরা আমাদের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।' মাথায় হাত দিয়ে সবাই এ কথাই শুধু বলাবলি করতে লাগলো।
খলিফা ছিল অপরিণত বয়সের নির্বোধ বালক, তার দুই উপদেষ্টা তাকে পরামর্শ দিল, 'চলুন, সুলতান আইয়ুবীর সাথে আমরা আপোষ করে ফেলি।'
সাইফুদ্দিন ও গুমাস্তগীনসহ কয়েকজন আমীর এ প্রস্তাবে বাঁধা দিয়ে বললেন, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তো দু'দিনের মেহমান।

নতুন করে ফেদাইন গ্রুপ পাঠানো হচ্ছে। তারা সুফি দরবেশের বেশে সালাহউদ্দিনের কাছে এই আবেদন নিয়ে যাচ্ছে, তিনি যেন যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করে তাবলীগের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমানের তরক্কীর জন্য কাজ করেন। সুলতান আইয়ুবী তাদেরকে সসম্মানে পাশে বসাবেন। নির্জন কামরায় বসে তিনি যখন তাদের কথা শুনবেন, তখন ফেদাইনরা তাঁকে আরামের সাথে হত্যা করে বেরিয়ে আসবে। এরা এমন মানুষ, যাদের নিজের জীবনের জন্যও কোন মায়া নেই।'
তারা আস সালেহকে মিথ্যা বলেনি। সুলতান আইয়ুবী যখন 'আর রিস্তান' পর্বত মালায় বসে পরবর্তী পদক্ষেপের প্ল্যান তৈরী করছিলেন, নয়জন পেশাদার ফেদাইন খুনী হলবে বসে প্ল্যান করছিল, কোথায় কিভাবে আইয়ুবীকে হত্যা করা যায়।

মিশরে যেখানে এখন আসোয়ান বাঁধ, আটশ বছর আগে সেখানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিক সুলতান আইয়ুবীর এই যুদ্ধের কোন উল্লেখই করেননি। কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ তাঁর ডাইরীতে এ সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। লিখেছেন, সুলতানের এক জেনারেল, নাম আলকিন্দি, মিশরের বাসিন্দা। তার মা ছিল সুদানী। এই সূত্র ধরে সুদানীরা যোগাযোগ করে তার সাথে। তাকে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উস্কানী দেয় তারা।
সে সময়কার লেখকদের লেখা থেকেও এই বিদ্রোহের মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যায়।

১১৭৪ খৃস্টাব্দের শেষ দিক থেকেই সুলতান আইয়ুবী মিশরের বাইরে ছিলেন। ইতিহাসে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে দুঃসাহসিক অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন তিনি।

নূরুদ্দিন জঙ্গীর ওফাতের পরপরই সিরিয়ায় সুবিধাবাদী আমীররা নূরুদ্দিন জঙ্গীর এগারো বছরের বালককে সিংহাসনে বসিয়ে এবং খৃস্টানদের সাথে জোট বেঁধে স্বাধীনভাবে চলার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তার মোকাবেলা করছিলেন সুলতান। নইলে ইসলামী জগতের রাজ্যগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে খৃস্টানদের পেটের মধ্যে চলে যেতো।

সুলতান আইয়ুবী দামেশক এসে জনসাধারণের সহযোগিতায় দামেশক করায়ত্ব করলে খলিফা ও তাঁর সহকারী জেনারেল, আমীর ও উজিররা সবাই হলবের দিকে পালিয়ে যায়। সেখানে তারা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে খৃস্টানদের সামরিক সাহায্য লাভের আশ্বাস পায়। কিন্তু খৃস্টানরা অর্থ নিয়ে আশ্বাসের নামে ধোঁকা দেয় তাদের।

সুলতান আইয়ুবী হেম্মাত ও হেমসের কেল্লা দখল করে দীর্ঘ দিন হলব অবরোধ করে রাখার সময় যখন খবর পান তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে ত্রিপোলীর খৃস্টান রাজা, তখন তিনি অবরোধ তুলে ছুটে যান রিমাণ্ডকে বাঁধা দিতে।

সুলতান আইয়ুবীর কৌশল ও সাহসের কাছে পরাজিত হয় রিমাণ্ড, যুদ্ধ না করেই পালিয়ে যায় তার বাহিনী।

কিন্তু তাতেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি। বরং বলা যায়, আসল যুদ্ধে শুরু হয় এখান থেকেই।

সুলতান আইয়ুবী আর রিস্তান পর্বতমালার ওপরে ও আশেপাশে তার সৈন্য ছড়িয়ে রেখেছিলেন। এখন তাঁর যুদ্ধ চলছে তিন শত্রুর সাথে। একদিকে আস সালেহ ও তার আমীরদের রক্ষী সৈন্য, অন্যদিকে খৃস্টান বাহিনী আর সবার উপরে ছিল হাড় কাঁপানো কঠিন শীত।

১১৭৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাস। পাহাড়ের গায়ে বরফ জমে আছে, চূড়ায় বরফের স্তুপ। তুষার ঝড় বইছে, কখনো আস্তে, কখনো বেশ জোরে। প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে আইয়ুবীর সৈন্যরা। সুলতান ওঁৎ পেতে বসে আছেন রিমাণ্ডের ফিরে আসার অপেক্ষায়। রিমাণ্ডের সাথে বুঝাপড়া শেষ না করে তিনি হলব যেতে পারছেন না, দামেশক বা মিশর ফিরে যেতে হলেও এর একটি সুরাহা করে যেতে হয়।
মিশর সম্পর্কে থেকে থেকেই চিন্তা হচ্ছিল তার। অনেকদিন ওখান থেকে বেরিয়েছেন তিনি। নিশ্চিত নন, সেখানকার সেনা বিভাগ এখন কি করছে। শাসন বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে এসেছেন ছোট ভাইয়ের হাতে। তার কাছে যে সৈন্য ছিল তার থেকে কিছু নিয়ে এসেছেন নিজের সাহায্যের জন্য। কোন হুমকি এলে সে কি এই অল্প সৈন্য নিয়ে নিশ্চিত করতে পারবে মিশরের নিরাপত্তা?
উত্তরে সমুদ্র পথে খৃস্টানদের আক্রমণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। দক্ষিণ দিক থেকে সুদানীদের আক্রমণের ভয় তো আগে থেকেই ছিল। খৃস্টান ও সুদানীদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা

তিনি থাকতেই সারা মিশরে ছড়িয়ে পড়েছিল। গোয়েন্দারাও তৎপর ছিল ব্যাপকভাবে।
এ জন্যই সুলতান আইয়ুবী সুদক্ষ গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ানকে কায়রো রেখে এসেছেন। ভাইকেও এই দায়িত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করে অনেক নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সুলতান আইয়ুবীর শূন্যতা কি তাতে পূরণ হবে?

•

মিশরের সীমান্ত ও সাগর উপকূল এলাকা দেখাশোনা করার জন্য সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ও টহলদার বাহিনী নিয়মিত পাহারা দিয়ে যাচ্ছিল। সুলতান আইয়ুবী ভাইকে বলেছিলেন, 'সুদানের বর্ডারে সামান্য গোণ্ডগোল দেখা দিলেও কঠিন হাতে তার মোকাবেলা করবে। প্রয়োজনে সুদানের ভেতরে গিয়ে হলেও দমন করবে ওদের।'
কিন্তু একটি বিষয়ে কিছুই বলেননি তাকে। বিষয়টি সীমান্ত রক্ষীদের বদলী সংক্রান্ত। সীমান্ত রক্ষীদের কিছুদিন পর পর বদলী করার কথা তিনি ভাইকে বলে আসেননি। এখন মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারেও ওকে সতর্ক করে আসা দরকার ছিল।

সীমান্ত রক্ষী দলের অধিকাংশ সৈন্য ও কমাণ্ডাররা একাধিক বছর ধরে সীমান্তে একই জায়গায় ডিউটি দিয়ে যাচ্ছিল। শত্রুদের সাথে এরা একাধিক যুদ্ধ করেছে। এ জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে এরা ছিল আপোষহীন।
এর আগে যে দলটি এখানে ডিউটি করতো, তারা কাজকর্মে

বিশ্বস্ততা দেখাতে পারেনি। তাদের চোখের সামনে দিয়ে মিশরের হাটবাজার থেকে খাদ্যশস্য ও দরকারী পণ্য পাচার হয়ে সুদানে চলে যেত। সুলতান আইয়ুবী এ খবর পেয়ে তাদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। নতুন যে বাহিনী সীমান্তে পাঠিয়ে ছিলেন, যুদ্ধ ফেরত সেই সৈন্যরাই এখনো সেখানে ডিউটিতে আছে।

এই বাহিনী সীমান্তে এসেই ভীষণ তোড়জোড় শুরু করে দেয়। টহলদার বাহিনীর চোখে কোন জিনিস একটু নড়াচড়া হলেই গিয়ে ঘাড় চেপে ধরে। তারা খুবই সতর্ক ছিল এবং চারদিকে ওদের সতর্ক দৃষ্টি থাকতো সব সময় সজাগ। তাদের এ সতর্কতার কারণে সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এটা প্রায় দুই আড়াই বছর আগের কথা। প্রথম প্রথম এই বাহিনীর মনে জাতীয় চেতনা ও ঈমানী জযবা অটুট ছিল। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা নিয়েই কাজ করে যাচ্ছিল তারা। কিন্তু আস্তে আস্তে এ চেতনায় ভাটা পড়তে লাগলো।

সুলতান আইয়ুবী প্রত্যেক দিক, প্রত্যেক কোণ ও প্রতিটি উপাদানের ওপর দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু তিনি মিশরে না থাকায় সীমান্তের প্রহরী সৈন্যদের বদলীর ব্যাপারটিতে নজর দিতে পারেননি।

সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল যার হাতে, তার নাম আলকিন্দি। তাঁর ওপর নির্দেশ ছিল, 'বছরে অন্তত: দু'তিনবার

প্রহরীদের বদলী করে অন্য এলাকায় পাঠাবেন।'

কিন্তু তিনি এর প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। তার ফল যা হওয়ার তাই হলো, নানা দোষ ত্রুটিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ল সৈন্যরা। একঘেঁয়েমী ও ঢিলেমী পেয়ে বসলো সৈন্যদের।

প্রথম দিকের কঠোরতায় সুদানীদের তৎপরতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফলে চোরাচালানীরা এ কাজ ফেলে অন্যদিকে মন দিয়েছিল।

এতে করে সৈন্যদের অবসর ও আলসেমী বেড়ে গেল। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা, তাদের মনে নানা কু-প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো।

তাদের কোন কাজও ছিল না, কোন চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থাও ছিল না। সীমান্তের এ এলাকাটি ছিল এমন, এখানে ঋতুবৈচিত্রও চোখে পড়তো কম।

আদিগন্ত বালির মাঠ ও প্রান্তর, কোথাও দু'একটি টিলা, এ ছাড়া আর কিছুই দেখার ছিল না তাদের। যেন এই আবহাওয়া ও পরিবেশ শতাব্দী ধরে চলে আসছে। এখানে আকাশের রঙ বদল হয় না। যেসব মুসাফিররা পথ চলে একই রকম তাদের পোষাক-আশাক, একই রকম তাদের চলার ধরন।

এসব দেখতে দেখতে সিপাইদের মনে বিরক্তি ধরে গেলো। টহলদার বাহিনী এখন আর ডিউটির সময় মুসাফিরদের তল্লাশী চালায় না। ওরা কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে

এসব প্রশ্নও করে না অনেক সময়। বড়জোর একঘেঁয়েমী দূর করার জন্য মাঝে মধ্যে কোন কাফেলাকে থামিয়ে গল্প-গুজব করে কিছুটা সময় কাটায়। আর মুসাফিররাও কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ নিয়ে নেয় এই ফাঁকে।

যে সব ফাঁড়ির পাশে গ্রাম আছে, সেসব গ্রামে গিয়ে গল্প-গুজব করে মন হাল্কা করে আসতো কোন কোন সিপাই।

দেশের সীমান্ত রক্ষীদের এই অবস্থা দেশের জন্য খুবই মারাত্মক ছিল। মানুষের মন আনন্দ ও শান্তির কাঙাল। কোন কাফেলা রাত কাটানোর জন্য কোথাও ক্যাম্প করলে, সৈন্যরা সেখানে গিয়ে ওদের আনন্দ স্ফূর্তির সাথে একাত্ম হয়ে যেতো। এমনকি পার্শ্ববর্তী গ্রামের আনন্দ অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে শুরু করলো।

এভাবে খোলামেলা মেলামেশার ফলে সীমান্ত রক্ষী ও সৈন্যদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মন থেকে সব ভয় ভীতি দূর হয়ে গেল। তাদের কমাণ্ডারও সিপাইদের মতই মানুষ, তারাও সময় কাটানো এবং চিত্ত বিনোদনের জন্য ফৌজি মেজাজ রেখে সহজ সরল আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গেল।

সুলতান আইয়ুবী দামেশক রওনা হওয়ার সময় ব্যস্ততা ও টেনশনের কারণে সীমান্ত রক্ষীদের বদলীর ব্যাপারে কোন আদেশ দিয়ে যাননি ঠিক, কিন্তু তিনি আশ্বস্ত ছিলেন, জেনারেল আলকিন্দি অভিজ্ঞ অফিসার, এসব ব্যাপারে নিশ্চয়ই তিনি খেয়াল দেবেন।

সুলতান আইয়ুবীর যাওয়ার পর তার ভাই তকিউদ্দিন সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আলকিন্দিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সীমান্তে যে সৈনিকরা পাহারা দিচ্ছে ওরা কতদিন ধরে ওখানে আছে?'
আলকিন্দি উত্তর দিল, 'তারা অনেক দিন ধরেই সেখানে ডিউটি করছে।'
'সীমান্তে কি আরও বেশী টহল বাহিনী পাঠানোর দরকার আছে?' তকিউদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, 'আর, পুরাতন দল কায়রো এনে নতুন দল কি পাঠানো দরকার?'
'না।' আলকিন্দি উত্তর দিল, 'সুলতান এদের যে আশায় পাঠিয়েছিলেন, ওরা সে প্রত্যাশা পূরণ করেছে। এরাই তো দেশের শস্য, সম্পদ, পশু ও অস্ত্রশস্ত্র বিদেশে পাচার রোধ করেছে। সীমান্ত এখন তাদের নখদর্পনে চলে এসেছে। সন্দেহজনক লোককে দূর থেকে তারা সনাক্ত করে ফেলতে পারবে। গন্ধ শুঁকে ধরে ফেলতে পারবে দুশমন। এমন অভিজ্ঞ দলকে সরিয়ে নতুন দল পাঠালে পারদর্শী হতেই তাদের লেগে যাবে বছর খানেক। তারচে যারা আছে তারাই থাক। এসব আস্থাভাজনরা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমরা টেনশন ও ঝুঁকি মুক্ত থাকতে পারবো।'
তকিউদ্দিন এই উত্তরে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কারণ তাঁকে তো আর কেউ বলেনি, 'ডাল মেঁ কুছ কালা হ্যায়!'
আলকিন্দি রাতে ঘরে বসে তার মামাকে বলছিলো, 'সীমান্ত রক্ষীরা এখন অকেজো হয়ে গেছে। আমার চেষ্টা সফল

হয়েছে, আমি তাদের বদলি হতে দেইনি। তারা সীমান্তবর্তী এলাকার লোকদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে। তাদের পেট এখন সব সময় ভরা থাকে। খাওয়া-পরা নিয়ে তাদের কোন অভিযোগ নেই। আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার তাদের ঘরে পৌছে দেই।

কিন্তু একটি অভাব এখনো রয়ে গেছে তাদের। এ জন্য তারা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত হয়ে থাকে। কোন কাফেলা সামনে পেলেই তাদের নারীদের মুখ খুলে দেখে।'

'এ অভাবও তাদের বেশী দিন থাকবে না। আমরা তাদের এ ক্ষুধাও মেটানোর ব্যবস্থা করতে পারবো।'

তিনি যার সঙ্গে কথা বলছিলেন, সে একজন সুদানী, সম্পর্কে তার পাতানো মামা।

সে এখানে এসেছে মেহমান হয়ে। তাদের জন্য নিয়ে এসেছে বিস্তর উপঢৌকন। তার আপন মামার একটা চিঠিও আছে সাথে।

সে আলকিন্দিকে বললো, 'তোমার ভাগ্যই ভাল। সুদানীরা তোমার কাছ থেকে যত সাহায্য পাবে ততই খুলে যাবে তোমারও ভাগ্য। এ সুযোগে ভালই 'দাও' মারতে পারবে তুমি।'

'কিন্তু আমি ওদের কতটুকুই বা সহযোগিতা করতে পারবো!'

'আরে বলো কি! তোমার হাতেই তো সব চাবিকাঠি। শোন, ওরা গোপনে মিশরে কিছু সৈন্য পাঠাতে চায়। তুমি যদি এ সৈন্যদের কোন প্রকারে মিশরে ঢুকিয়ে দিতে পারো, তুমি তো

দু'দিনেই রাজা বনে যাবে!'

আলকিন্দি বললো, 'এ আর এমন কঠিন কি কাজ! আপনি শুধু আমাকে জানাবেন, কখন আসতে চায় ওরা। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখবো।'

আলকিন্দি সেই কয়েকজন সেনাপতির অন্যতম, যাদের ওপর সুলতান আইয়ুবী ভরসা ও বিশ্বাস রাখতেন। আলকিন্দি তার কাজকর্ম ও আচরণে সে যে মিশর সরকারের অনুগত নয় এমন কোন সন্দেহ করার অবকাশ রাখেনি। আলী বিন সুফিয়ানকে পর্যন্ত সে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছিলো।

তার প্রতি এই বিশ্বাস ও আস্থার কারণ ছিল, সে কঠোর হাতে চোরাচালান বন্ধ করেছিল এবং গত দুই আড়াই বছর ধরে চোরাচালান পুরোপুরি বন্ধ আছে। এই সুনামটাই তাকে সন্দেহের উর্ধে নিয়ে গিয়েছিলো।

সীমান্ত জুড়ে এ বিশ্বস্ত ব্যক্তিটির রহস্যময় তৎপরতার খবর কেউ জানতে পারলো না।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মিশর থেকে বিদায় নেয়ার সময় আলকিন্দি তকিউদ্দিনকে আশ্বাস দেয়, 'সুদানের দিক থেকে যে কোন তৎপরতার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। সুদানের কোন অপতৎপরতা তো দূরে থাক, সুদানের কোন পক্ষীও মিশরের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না।'

অপরদিকে তারই প্রশ্রয়ে ও সহযোগিতায় সুদানের একদল হাবশী সৈন্য গোপনে মিশর আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

এসব হাবশীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মিশরে প্রবেশ করে। তারা অতি গোপনে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কায়রোর সন্নিকটে একত্রিত হয়। তাদের ইচ্ছা, সুযোগ মত কোন এক রাতে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তারা মিশর দখল করে নেবে।

•

নীলনদ সুদূর দক্ষিণ থেকে প্রবাহিত হয়ে সুদানের মধ্য দিয়ে মিশরের ভেতর প্রবেশ করেছে। মিশরের মাটিতে প্রবেশ করে নীলনদ এক জায়গায় বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে ঝিলের মত এক জলাধার সৃষ্টি করেছে। সেখান থেকে একটু এগিয়ে সামনে পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করেছে। তারপর সেই পানি জলপ্রপাতের আকারে আবার নেমে গেছে নিচে।

এ জলপ্রপাতের পার্শ্ববর্তী এলাকার নাম আসোয়ান। সুলতান আইয়ুবীর শাসনকালে আসোয়ানের আশপাশের অঞ্চলগুলোর ভৌগোলিক অবস্থা ছিল ভিন্ন রকম।

বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাহাড়ী উপত্যকা, মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতমালার সুউচ্চ শৃঙ্গ।

এ অঞ্চলের ওপর ফেরাউনের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। ফেরাউন সম্রাটরা পাহাড়গুলো কেটে ছেটে সাইজ করে মূর্তি তৈরী করেছিলো। এ সব মূর্তির মধ্যে সবচে বিশাল মূর্তি ছিল 'আবু সাম্বালের মূর্তি'।

অন্যান্য পাহাড় কেটেও বানানো হয়েছিল মন্দির এবং ইবাদতখানা। এগুলোর উঁচু মিনার ও মন্দিরের চূড়া দূর থেকে

দেখা যেত।

কোনটাতে আবার ফেরাউনের মুখ বানানো ছিল। কোথাও পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছিল সুরম্য বাসস্থান, সুন্দর সুন্দর কামরা, আঁকাবাঁকা পেঁচানো গোলক ধাঁধাঁয় ভরা সুড়ং পথ।

ফেরাউনদের ছিল অঢেল ধনরত্ন। এই সম্পদের অহমিকায় তারা নিজেদের ভাবতো সর্বেসর্বা। শক্তি ও ক্ষমতার গর্বে এসব সম্রাটরা নিজেদের 'খোদা' বলে দাবী করতো। এই বিস্ময়কর গোপন জগত তারা কি জন্য বানিয়েছিলো সে রহস্য উদ্ধার করা কঠিন। কিন্তু এই মূর্তি ও খোদাই করে পাহাড়ের নিচে মহল তৈরী করতে তাদের বহু সময় অতীত হয়ে গিয়েছিল। মনে করা হয়, সম্পদের সুরক্ষা ও ফেরাউনদের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্যই তারা এই বিপুল ব্যয় ও কর্মযজ্ঞে মেতে উঠেছিল।

জনসাধারণকে এসব ফেরাউনদের সামনে সিজদা করতে হতো। খোদার নির্দেশের মতই তাদের প্রতিটি আদেশ মান্য করতে হতো। ফেরাউনের সামনে সম্পূর্ণ অসহায় দরিদ্র, নিপীড়িত ও ক্ষুধার্ত প্রজাদের দিয়ে কাটানো হতো এসব পাহাড়।

এখন সেখানে কোন মূর্তি নেই, কোন মহলও নেই, নেই কোন পাহাড়ও। এখন সেখানে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত আসোয়ান বাঁধ ও ঝিল। এই বাঁধ তৈরীর সময় সেখানকার বিশাল মূর্তি খোদাই পাহাড়গুলো বড় বড় ক্রেন ও ড্রেজার দিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়। ফেরাউনের যুগের স্মৃতি স্বরূপ 'আবু

সাম্বালের মূর্তি' রেখে বাকি সমস্ত পাহাড় ও টিলা ডিনাইমাইট দিয়ে উড়িয়ে গুড়ো করে দেয়া হয়।

মজলুম জনতার খুন ও ঘাম দিয়ে তৈরী পাহাড় সমান মূর্তিগুলোর এই করুণ পরিণতি এবং মানুষের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির এই বিপুল বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ যদি দেখতে পেতো ফেরাউন, তবে তার 'খোদা' হওয়ার সাহস চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যেতো।

সুলতান আইয়ুবীর যুগে এ অঞ্চল ছিল পার্বত্য টিলা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উঁচু নিচু অঞ্চলের চেহারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে পর্বতগাত্রের ছোট বড় অসংখ্য গুহায় লুকিয়ে থাকতে পারতো অসংখ্য সৈন্য। এমন দুর্গম ও রহস্যে ভরা সীমান্ত অঞ্চল আসোয়ানের দিকে সুলতানের ছিল বিশেষ ঝোঁক। এখান থেকেই নীলনদ বয়ে গেছে মিশরের সমতল ভূমিতে।

সুদানীদের গোপন যাতায়াত এই নদী পথেই চলতো। তারা নৌকাযোগে ভাটির দেশ মিশরে অনায়াসেই প্রবেশ করতে পারতো। এই নদী পথে কড়া দৃষ্টি রাখার জন্য সুলতান আইয়ুবী একটি চৌকস প্রহরী ফাঁড়ি স্থাপন করেছিলেন। এই ফাঁড়িটা নদী থেকে একটু দূরে গোপন জায়গায়। সে কারণে ফাঁড়ি থেকে সরাসরি নদীর দৃশ্য দেখা যেত না, আবার নদী থেকেও ফাঁড়ি দেখা যেত না। এই দূরত্ব ভেবে চিন্তেই রাখা হয়েছিল, যেন নদী পথে গোপনে চোরের মত যাতায়াতকারী চোরাচালানী বা শত্রুরা মিশরে প্রবেশ ও মিশর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নিশ্চিন্ত থাকে, কেউ তাদের দেখতে পাচ্ছে না,

ধরতেও পারবে না।

টহলদার সৈনিকরা গোপন পাহারায় তাদের দিকে দৃষ্টি রাখতো। দুই অশ্বারোহী সবসময় নদীর তীরে টহল দিয়ে বেড়াতো, নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটি পরিবর্তন হতো তাদের।

মিশরে সুলতান আইয়ুবীর অনুপস্থিতির সুযোগে সেখানে ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠতে থাকে। টহলদার প্রহরীদের পাহারায় দেখা দেয় শিথিলতা। তারা দিনের বেলায় নদী পথে দৃষ্টি রাখার জন্য বেরিয়ে এসে একটু ঘোরাঘুরি করে ইচ্ছেমত চলে যায় এখানে ওখানে। ডিউটি নয়, যেন ওরা প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছে।

টহল ফাঁড়ি থেকে বেরিয়ে নদীর তীর ধরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেলে একটি সবুজ শ্যামল বাগান ও বনভূমি পড়ে। ওখানকার মনোরম দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে দেয় যে কোন মানুষের। বিশ্রামের জন্য এরচে সুন্দর জায়গা আর হয়না। সেখানে বৃক্ষের কোমল ছায়া, সবুজ ঘাসের গালিচা আর নদীর ঝিরঝির বাতাসে সহজেই ঘুম এসে যায়।

টহলরত অশ্বারোহীরা প্রায়ই সেখানে গিয়ে আরাম ও বিশ্রাম করে। দীর্ঘদিন কোন সুদানী চোরাচালানী, দুষ্কৃতকারী বা গুপ্তচরদের আনাগোনা দেখতে না পেয়ে তারা বড় শান্তিতে আছে।

আগে তারা অনেক গুপ্তচর, স্মাগলার ও দুষ্কৃতকারী অহরহ পাকড়াও করতো। সেই ধরপাকড়ের ফলে বন্ধ হয়ে যায় ওদের তৎপরতা, বিরাণ হয়ে যায় নদীর সেই পারাপারের

পথ। তাই পাহারা দেয়ার গরজ হারিয়ে ফেলে প্রহরীরা। ওই বাগানে গিয়ে আরাম করে ডিউটির সময়।
বাগানে যাওয়া এখন এই আশ্বারোহীদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু এক সময় বাগানে যাওয়ার আকর্ষণও পানসে হয়ে উঠল তাদের কাছে। নদী পাড়ের সবুজ শ্যামল বাগান এখন আর তাদের আকর্ষণ করে না। প্রতিদিন একই দৃশ্য তাদের কাছে বৈচিত্র্যহীন ও একঘেঁয়ে হয়ে উঠলো। তবু তারা সেখানে যায়। তাকিয়ে দেখে বন বিড়াল, বাঘদাস, ও অন্যান্য মরুপ্রাণীর নদীতে নেমে পানি পান করার দৃশ্য। প্রহরীদের দেখলেই ওরা ছুটে পালিয়ে যায়।
কখনো জেলেদের মাছ ধরা নৌকা ভেসে উঠে তাদের চোখের সামনে। ওরা এগিয়ে গিয়ে জেলেদের ডেকে জিজ্ঞেস করতো, 'এই, তোমরা কোথাকার লোক? পরিচয় কি?'
এখন আর তাও জিজ্ঞেস করে না। নৌকার মাঝি মাল্লা ও জেলেরা এখন আর কুলে ভিড়ার প্রয়োজন বোধ করে না।
প্রহরীরা বসে বসে গল্প করছিল। একঘেঁয়ে জীবনের কথা, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন মরুভূমিতে একাকী জীবন কাটানোর কথা বলছিল ওরা আফসোস করে। তাদের বন্ধু ও সাথীরা মিশরের বিভিন্ন শহর– কায়রো, সেকেন্দারিয়া ও অন্যান্য শহরে কেমন আরামের জীবন কাটাচ্ছে! আর তারা এই জঙ্গল ও মরুভূমিতে পড়ে আছে বিরস বদনে। তাদের কণ্ঠে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ভাব ফুটে উঠে।

দু'জন প্রহরী সেই মনোরম বাগানে যাচ্ছিল। দূর থেকেই ওরা দেখতে পেল, সেখানে চার পাঁচটি উট বাঁধা রয়েছে আর আট দশজন লোক সেখানে বসে বিশ্রাম করছে। চারজন লোক নদীতে নেমে গোছল করছে।

এ দৃশ্য দেখে প্রহরী দু'জন সেখানে এগিয়ে গেল। তারা অবাক হলো, লোকগুলোর বেশভুষা দেখে। আরো অবাক হলো, যাদেরকে ওরা গোছল করতে দেখেছিল, ওরা কেউ পুরুষ নয়, চারজনই যুবতী।

এতে প্রহরীদের একটু সংকোচবোধ হলো। হালকা চিকন কাপড়ে বুক বেঁধে ডুবাচ্ছিল ওরা। গভীর পানিতে নামেনি, কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে ডুবাচ্ছে। তাদের দেহের রঙ খুব যে ফর্সা তা নয়, তবে অসম্ভব লাবন্যময়। এমন লাবন্য, যেখান থেকে চোখ ফিরানো কষ্টকর।

মিশরের মেয়েদের তুলনায় এরা অনেক বেশী আকর্ষণীয়। তারা বার বার ডুব দিচ্ছে আর ভেসে উঠেই ফেটে পড়ছে খিল খিল হাসিতে।

অশ্বারোহী দু'জনের মনে হলো, এরা কেউ মাটির মানুষ নয়, এরা আকাশ থেকে নেমে আসা কোন জলপরী, নয়তো ফেরাউনের রাজকন্যা, মমির খোলস ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে।

দুই প্রহরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে লাগলো। হঠাৎ মেয়েগুলোর চোখে পড়ে গেল ওরা। ওদের দেখেই মেয়েরা তড়িঘড়ি লজ্জা ঢাকায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তাই দেখে লজ্জা পেল প্রহরীরাও। ওরা দু'জন সেখান থেকে সরে পড়ার জন্য

ঘুরে দাঁড়াল।

বসে থাকা লোকগুলো এতক্ষণ তাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল। তাদের ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ দেখে দু'জন লোক তাড়াতাড়ি উঠে অশ্বারোহীদের কাছে এগিয়ে গেল। মেয়ে চারটি ওদের দেখেই দ্রুত নদীর কিনারে উঠে এক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

মেয়েগুলো চোখের আড়ালে গেলে অশ্বারোহীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। যেন বুকের মধ্যে আটকে থাকা ভয় ভুস করে বেরিয়ে গেল সুযোগ পেয়ে।

সীমান্ত প্রহরী হিসাবে ওদের ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু লুকিয়ে মেয়েদের রূপসুধা পান করার অপরাধবোধই তাদের ভীত করে তুলেছিল।

লোক দু'জন এগিয়ে এসে ঝুঁকে তাদেরকে সালাম দিলো। পরণে মরুচারী বেদুঈনদের পোষাক। বললো, 'আমরা কায়রোর ব্যবসায়ী। সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলো থেকে মালামাল ক্রয় করে শহরে নিয়ে বিক্রি করি।'

'এটা তো কায়রো যাওয়ার রাস্তা নয়!', এক অশ্বারোহী বললো।

'এই মেয়েদের বড় সখ হলো, তারা নদী দেখতে দেখতে যাবে।' একজন উত্তরে বললো, 'আমাদের কেনাকাটা শেষ, এখন তেমন তাড়া নেই। ভাবলাম, ওদের শখ মিটুক, আমরাও কাজের ফাঁকে একটু বেড়ানোর সুখ নিয়ে নেই।'

'ভালই তো সুখে আছো দেখছি! এক সাথে রথ দেখা কলা

বেচা দুটোই সেরে নিচ্ছো।'
'একটু সুখের জন্যই তো মানুষ এত কষ্ট করে। ব্যবসার কাজে বলতে গেলে তো সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকি। তাই বলে কি আমাদের সাধ-আহলাদ বলতে কিছু নেই? দুটো রাত এই সুন্দর পরিবেশে কাটানোর লোভ ছাড়ি কি করে!'
'কি বললে! তোমরা এখানে আরো দু'দিন থেকে যাবে?'
'ওরকমই ইচ্ছে। চলুন, আমাদের মালসামান পরীক্ষা করে দেখবেন। এবার বহু টাকার মাল কিনেছি, দেখলেই বুঝতে পারবেন, ব্যবসায়ী হিসাবে আমরা মন্দ নই।'
অশ্বারোহীরা ঘোড়া দুটো এক গাছের সাথে বেঁধে লোক দুটোর সাথে ওদের ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হলো।
দু'জন সরকারী প্রহরীকে দেখে সবাই দাঁড়িয়ে নত হয়ে সালাম করলো ওদের, এরপর একে একে এসে মুসাফাহা করলো।
একজন বললো, 'আমরা কি এখনি মাল-সামানের মুখ খুলে দেখাবো?'
প্রহরীরা একে অন্যের দিকে চাইল। একজন বললো, 'তার আর দরকার নেই। মালপত্র কিছুই আমাদের দেখানো লাগবে না।'
ব্যবসায়ীরা গল্প জুড়ে দিল প্রহরীদের সাথে। কথায় কথায় একজন সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদের অশেষ প্রশংসা করলো।
এক যুবক অশ্বারোহী সৈনিকদের দেখিয়ে বললো, 'আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সৈন্য বিভাগে ভর্তি হই। তাহলে আমারও আপনাদের মত সুন্দর স্বাস্থ্য থাকতো।'

'সুন্দর স্বাস্থ্য হলেই কেউ বড় যোদ্ধা হয় না।' বললো আরেক যুবক, 'উনাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, বীরত্ব ও কঠিন দায়িত্ববোধই সৈনিকদের সাফল্যের চাবিকাঠি।'
'হ্যাঁ, তাই। সাহস ও নিষ্ঠা ছাড়া কেউ সৈনিক হতে পারে না।'
এভাবেই চলছিল তাদের খোশালাপ। তারা এমন কোন কথা বললো না, যাতে তাদের পরিচয় নিয়ে সৈনিকদের মনে কোনরকম সন্দেহ জাগতে পারে।
ততক্ষণে সেই মেয়েরা কাপড় পরে চুল আঁচড়ে সেজেগুজে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো।
কিন্তু তারা একটু লজ্জিত ও সংকোচ ভরা মনে সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল।
এ বিরাণ মরুভূমিতে দীর্ঘ দুই আড়াই বছর পর বাইরের কোন কাফেলা দেখলো সৈনিকরা। যে কাফেলায় আছে ভরা যৌবনের যুবতী চার মেয়ে। তাদের লাবন্যময় চেহারার ছবি বুকে সেঁটে রইল তাদের। ইচ্ছে করছিল না, এদের সঙ্গ ছেড়ে এখনি এখান থেকে চলে যায়।
ওরা আপন পরিচিত নারীর সাথে এই মেয়েদের বিভিন্ন রূপ কল্পনা করে মিলিয়ে নিতে চাইলো। এরা এমন নারী, যাদেরকে মা হিসাবে কল্পনা করা যায় না। বোন বা স্ত্রী হিসাবেও নয়। কন্যা তো নয়ই।
দু'জনেই কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। মেয়েরা নতুন দু'জন পুরুষ মানুষ দেখে একটু

লজ্জাবোধ করছিল এবং আড় চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে মুখ লুকিয়ে হাসছিল। তাদের লাজুক লাজুক ভাব ও আড়াল হওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, এরা কোন অভিজাত বংশের আদুরে কন্যা।

কাফেলার লোকদের আন্তরিক ব্যবহার ও প্রশংসা শুনে এ দুই সীমান্ত প্রহরী বিগলিত হয়ে গেল। লজ্জাবতী মেয়েদের লাবন্যময় রূপ ও যৌবনের আকর্ষণ তাদের মনে সৃষ্টি করল মোহগ্রস্ত মুগ্ধতা। ডিউটির কথা ভুলে গিয়ে ওরা ওখানেই পড়ে রইল।

কাফেলার একজন বললো, 'আমরা এখানে থাকবো কি থাকবো না, এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম। অচেনা জায়গা, সঙ্গে মেয়েরা, বিপদাপদের কথা তো বলা যায় না!' লোকটি বললো, 'আপনাদের দেখে মনে সাহস এলো।'

'আরে না না, এ এলাকায় ভয়ের কোন কারণ নেই। এখানকার শান্তি শৃংখলার পরিস্থিতি যথেষ্ট ভাল।'

'এটা আপনাদের সততা, যোগ্যতা ও নৈপূণ্যের ফল। আরে, রাজা ভাল তো দেশ ভাল। আপনারা আছেন বলেই দেশের মানুষ একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারছে, নির্বিঘ্নে পথ চলতে পারছে।'

'অমন করে বলবেন না, এটা তো আমাদের দায়িত্ব।'

'দায়িত্ব থাকলেই ক'জন আর এমন নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে!' লোকটি বললো, 'আপনাদের যদি অসুবিধা না হয় আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন, আমরা খুবই খুশী হবো।'

দীর্ঘ দিন যাবত নিরানন্দ জীবন কাটাতে কাটাতে হাঁপিয়ে উঠেছিল ওরা। এ আমন্ত্রণ ওদের কাছে আকাশের চাঁদ পাওয়ার মতই মনে হলো। দু'জনেই রাজি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

কাফেলার এক লোক ছিপ নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে গেল। আরো দু'তিনজন সঙ্গী হলো ওর। বড়শীতে টোপ গেঁথে পানির ওপর মাছের খাদ্য ছিটিয়ে দিল লোকটি। মাছেরা ভীড় করলো এসে সেখানে। লোকটি ছিপ ফেললো সে টোপের ভেতর।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বাকীরা দেখছিল তার কাজ।

মাছ বড়শীর টোপ গিললো, আটকে গেল বড়শীতে, সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বড়শী টেনে মাছটি ডাঙ্গায় তুলে ফেললো। যারা তামাশা দেখছিল তারা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল মাছটি। এভাবে সে একটার পর একটা অনেকগুলো মাছ ধরে ফেললো।

এক লোক মেয়েদের ডেকে বললো, 'এই, মাছ নিয়ে যাও, ভাল মত তেল মশলা দিয়ে আগুনে ভেজে নাও, দেখবে খেতে দারুণ লাগবে।'

চারজন মেয়েই আনন্দে ছুটে গেল সেখানে। মাছ এনে কেউ কুটে ধুয়ে পরিষ্কার করলো, কেউ মশলা পিষলো, কেউ বা উনুন জ্বালিয়ে রান্না শুরু করলো। সিপাইদের জীবনে এমন আনন্দময় পিকনিক উপভোগ করার সুযোগ কোন দিন হয়নি।

অশ্বারোহী সৈনিকরা ফাঁড়িতে যে একঘেঁয়ে জীবন কাটাচ্ছিল, সে জীবনে ক্ষণিকের জন্য হলেও নেমে এলো আনন্দের জোয়ার।

যদিও তাদের খাবার দাবার যথেষ্ট উন্নত ছিল তবু প্রতিদিনের রুটিন বাঁধা খাবারে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। নীল নদের পাড়ে বাগানের ফুল্ল হাওয়ায় বসে নদীর তাজা মাছ ভেজে খাওয়ার স্বাদই আলাদা।

মাছ ভাজছে মেয়েরা, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে মাছ ভাজার সুস্বাদু ঘ্রাণ। জিভে পানি এসে গেল সৈনিক দু'জনের।

সবাই মিলে খেতে বসলো, চমৎকার রান্না হয়েছে। পুরুষরা খাচ্ছে, মেয়েরা পরিবেশন করছে। এক সৈনিক খুব তারিফ করলো রান্নার। পরিবেশনকারী মেয়েটি লজ্জিতভাবে প্রশংসাটুকু উপভোগ করলো।

পুরুষদের আহারের পর খেতে বসলো মেয়েরা। পুরুষরা ঘাসের ওপর বিছানা পেতে আরাম করতে লাগলো।

মেয়েরা খাচ্ছে, আড় চোখে তাকিয়ে দেখছে ওদের। যখনি চোখে চোখ পড়ে লাজুক চোখ দুটো লজ্জায় নামিয়ে নেয়। এই লুকোচুরি ও লজ্জার সৌন্দর্যই আলাদা। এর আকর্ষণ এমন সুতীব্র যে, বার বার এ ফাঁদে পড়তে চায় ব্যাকুল মন।

মেয়েদের খাওয়া হয়ে গেলো। সৈন্যরা কাফেলার দু'তিনজন পুরুষের সাথে এক বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় গল্প করছিল, হঠাৎ এক সৈনিকের দৃষ্টি গেল তাদের ঘোড়ার দিকে।

এক যুবতী তার ঘোড়ার গর্দান ও কেশরে আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হাত দিয়ে জ্বীন নাড়াচাড়া করছে আর গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে ঘোড়াটিকে।

ঘোড়ার মালিক সৈনিকটি মেয়েটির কার্যকলাপ আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করছিল। মেয়েটি ঘোড়ার গায়ে ও গর্দানে আদর করে হাত বুলাতে বুলাতে ফিরে তাকালো ক্যাম্পের দিকে, মুহূর্তে চোখাচোখি হয়ে গেল ওর সাথে। ওর চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি একটু হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ঘোড়ার মালিক তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছে না। এমন সুন্দরী মেয়ে জীবনে আর কখনও দেখেনি সে। মেয়েটির প্রতি ক্রমেই সে দুর্বল হতে লাগলো।

বয়স্ক এক লোক বসেছিল সৈন্যদের পাশে। বললো, 'এই মেয়েদের ঘোড়ায় চড়ার খুব শখ। ঐ যে দেখছো মেয়েটা ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সবচে বেশী আগ্রহ ওর। তুমি কি ওদের এ আকাঙ্খাটুকু পূরণ করবে?'

'খুশীর সাথেই আমি ওদের এ সখ পূরণ করবো।' সিপাইটি বললো।

সে উঠে তার ঘোড়ার কাছে গেল। মেয়েটি সংকোচে সরে গিয়ে একটু দূরে দাঁড়াল।

'লজ্জা কিসের, এসো! আমি তোমাদের প্রত্যেকেরই সখ পূরণ করে দেবো। এসো ঘোড়ার পিঠে তুলে দেই।' সিপাহী বললো।

বুড়ো বললো, 'আরে, এদের দেখে লজ্জা পাচ্ছো কেন? এরা আমাদের গর্ব ও অহংকার। দেশের অতন্দ্র প্রহরী। তোমাদের ইজ্জত ও সম্মানের রক্ষক। এরা না থাকলে তো তোমাদের ইজ্জত-সম্মান খৃস্টান ও সুদানীরা কবেই শেষ করে দিতো!'

মেয়েটি সংকোচ মাখা পায়ে ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল। সিপাহী তার পা রেকাবে উঠিয়ে দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, এখানে পা রেখে উঠে পড়ো।'

সে মেয়েটিকে উঁচু করে ধরে তাকে ঘোড়ায় উঠে বসতে সাহায্য করলো।

এ সময় ক্যাম্পের দিক থেকে তার বন্ধু ডেকে বললো, 'এই, কি করছো?'

সে ওদিকে তাকাতেই সহসা ঘোড়া ছুটতে শুরু করলো। মেয়েটি চিৎকার জুড়ে দিলো। সিপাইটি ফিরে দেখলো, ঘোড়া পূর্ণ বেগে চলতে শুরু করেছে।

ঘোড়ার ওপর মেয়েটি এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে টিকে থাকার।

সবাই ছুটে এলো। মেয়েটি চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'ঘোড়ায় লাগাম নেই। আমি পড়ে যাচ্ছি। বাঁচাও আমাকে।'

সৈনিকের পাশেই তার সাথীর ঘোড়া দাঁড়ানো ছিল, সে দ্রুত লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো এবং জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

মেয়েটির লাগামহীন ঘোড়া তীর বেগে ছুটছে। মেয়েটি ঘোড়ার পিঠে শুয়ে পড়ে খামছে ধরেছে তার পিঠ। চোখের

পলকে মেয়েটিকে নিয়ে সামনের পাহাড়ী টিলার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোড়া।
সিপাহী তার ঘোড়ার গতি সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে গেল। তার ভয় হলো, মেয়েটি হয়ত ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে যাবে। সে কল্পনার চোখে দেখতে পেল, মেয়েটি গড়িয়ে পড়েছে ঘোড়া থেকে। তার পা আটকে আছে রেকাবে। সেই অবস্থাতেই তাকে টেনে নিয়ে ছুটছে ঘোড়া।
হয়তো এরই মধ্যে তার পায়ের হাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে, পাথরে বাড়ি খেতে খেতে মাথা থেতলে গেছে।
ও আর কিছু ভাবতে পারছিল না। ঘোড়া নিয়ে সে টিলা অতিক্রম করলো। লোকজনের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল মেয়ে এবং সৈনিক উভয়েই। লোকগুলো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
সামনে উন্মুক্ত মাঠ। সৈনিক দেখতে পেল, এখনো ঘোড়ার পিঠ আঁকড়ে আছে মেয়েটি। দেহে প্রাণ ফিরে এলো তার। আরোহীকে নিয়ে প্রাণপণ ছুটছে ঘোড়া।
আরও কিছু দূর গিয়ে ঘোড়া মোড় ঘুরে আরেক টিলার আড়ালে চলে গেল। আবার চোখের আড়াল হয়ে গেল ঘোড়া।
সৈনিকের কানে তখনও মেয়েটির চিৎকার ও ঘোড়ার পদধ্বনি ভেসে আসছে।
সিপাহীও সামনে গিয়ে মোড় নিল, কিন্তু অবাক কাণ্ড, কোথাও ঘোড়ার অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো,

মেয়েটির কোন চিৎকার ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে না আর।
মেয়েটির চিৎকার এবং অশ্বপদধ্বনি শুনতে না পেয়ে সিপাহী ভাবলো, ঘোড়া হয়তো আরোহীসহ কোন গিরিখাদে পড়ে গেছে।
সে ঘোড়ার গতি সামান্য কমিয়ে এগিয়ে গেল। আরেকটু এগুতেই সহসা পাহাড়ের আড়াল থেকে শোনা গেল মেয়েটির ডাক, 'এদিকে এসো, জলদি আমার কাছে এসো।'
যুবক সৈনিক আওয়াজ লক্ষ্য করে যখন তার দিকে তাকালো, রাজ্যের বিস্ময় এসে জমা হলো তার চোখে। সে দেখলো, শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া। তার পিঠে ততোধিক শান্ত মনে হাসি মুখে বসে আছে মেয়েটি। সম্পূর্ণ অক্ষত।
তার চেহারায় কোন ভয় ও আতংকের লেশমাত্রও নেই। বরং সে মুখে লেগে আছে মোহিনী হাসির আভা। যুদ্ধজয়ী বীরের মত উদ্ভাসিত সে হাসি।
সিপাহী একবার ভাবলো, ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যাই। এ কোন মানুষ নয়, নিশ্চয়ই কোন পরী কিংবা প্রেতাত্মা হবে। তাকে ধোঁকা দিয়ে নির্জন গোপন প্রান্তরে নিয়ে এসেছে। এখন সে আমার রক্ত পান করবে।
কিন্তু মেয়েটির সৌন্দর্যের সুষমা তাকে পাগল করে দিল। তার মিষ্টি হাসির সম্মোহনী শক্তি যেন সৈনিকটির ঘোড়াকে টেনে নিয়ে গেল তার কাছে। ভয়ে যুবকের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল।
যুবক সৈনিক তার কাছাকাছি পৌঁছতেই খিলখিল করে হেসে

উঠল মেয়েটি। 'তুমি না পুরুষ! আইয়ুবীর সেনাবাহিনীর চৌকস এক যোদ্ধা! তবে তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছো কেন? আমি তো এক নারী ছাড়া আর কিছু নই!'
মেয়েটি তার পাশে গিয়ে তার হাত তুলে নিল নিজের হাতে। বললো, 'ঘোড়াটি আসলে লাগামহীন ছিল না, আমিই ঘোড়াকে তাড়া করে চিৎকার দিয়ে বলছিলাম, আমার ঘোড়া লাগামহীন হয়ে গেছে, আমি পড়ে যাব, মরে যাব। আমি জানতাম, তুমি আমার পেছনে ছুটে আসবে। তোমার চেহারাই বলছিল তুমি আমাকে চাও।'
সৈনিক কোন কথা বলল না, অবাক চোখে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। মেয়েটিই আবার বললো, 'আমি আনাড়ী সওয়ারী নই। নিজেই তো দেখলে অশ্ব চালনায় কতটা পটু আমি।'
'তবে তুমি আমাকে ধোঁকা দিলে কেন?' সিপাহী জিজ্ঞেস করলো।
মেয়েটি পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'তুমি কেন তোমার চোখে নেশার আগুন নিয়ে তাকালে আমার দিকে! তোমার চাহনীর তীর দিয়ে কেন আমাকে আহত করলে?'
এ প্রশ্নের কোন জবাব ছিল না সৈনিকের মুখে। মেয়েটিই আবার মুখ খুললো, 'তোমার চাহনীর তীরবিদ্ধ হয়ে যখন আমি তোমার দিকে তাকালাম, তখন আমার মনেও নেশার ঘোর লেগে গেল। তোমার মত সুঠামদেহী সুন্দর যুবককে দেখে হৃদয় আমার ওলটপালট হয়ে গেল। আমি তো এসব

কথা সবার সামনে বলতে পারি না, তাই মনের কথা বলার জন্য তোমাকে একটু নিরালায় নিয়ে এলাম।'

সৈনিক এতক্ষণে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো, 'আশ্চর্য!'

মেয়েটি বললো, 'তুমি যে বুড়োর সাথে কথা বলছিলে, সে বৃদ্ধই আমার স্বামী। এখন তুমিই একটু বিবেচনা করো, আমার স্বামীর বয়স আর আমার যৌবনটা কি মিলমিশ খাওয়ার মতো?

আমার সঙ্গে যে মেয়েগুলো আছে তাদের মধ্যেও আরো একজনের অবস্থা আমার মতই। সেও এক বৃদ্ধের স্ত্রী হয়ে জীবন কাটাচ্ছে।

মেয়েদের দুর্ভাগ্য, তারা নিজের পছন্দমত পুরুষ বেছে নিতে পারে না। যার সঙ্গে তোমরা মেয়েদের বেঁধে দাও, তার সঙ্গেই তার সারাটা জীবন কাটাতে হয়। একটু প্রতিবাদ করারও সুযোগ নেই আমাদের।

এই বুড়ো আমাকে খুশী করার জন্য সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু নারীর সুখ কোথায় তা এই বুড়ো বুঝবে কি করে?'

সিপাহীর ভয় কিছুটা দূর হলো। মুখ দিয়ে কথা বেরোলো তার, 'আর বাকী মেয়ে দুটো?'

'ওরাও বিবাহিত, কেউ কুমারী নেই।' মেয়েটি উত্তরে বললো, 'তারা যুবক স্বামীকে সাথে নিয়ে ভ্রমণের আশায় আমাদের সঙ্গ নিয়েছে।'

'এখন তুমি কি করতে চাও?'

'আমি বাঁচতে চাই। যে যৌবন আল্লাহ আমাকে উপভোগ

করার জন্য দিয়েছেন, তা এভাবে বিনষ্ট করতে চাই না আমি। আমাকে বাঁচাও তুমি।'

'যদি তোমাকে ওরা চুরি করে বা ছিনতাই করে নিয়ে আসতো তবে আমি ওদেরকে আমাদের ফাঁড়িতে নিয়ে যেতে পারতাম। ওদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতাম তোমাকে।' সিপাহী বললো, 'কিন্তু তুমি একজনের বিবাহিতা স্ত্রী।'

'আমি ঐ বুড়োকে স্বামী বলে মানিনা। বুড়ো আমাকে জোর করে আমার অমতে বিয়ে করেছে।' মেয়েটি বললো, 'আমি তাকে ঘৃণা করি। যখন তোমাকে দেখলাম, তখন আমার ঘৃণা আরও বেড়ে গেল।'

সে আবেগময় স্বরে বলতে লাগলো, 'তোমাকে প্রথম দেখেই আমার মনে হলো, এই তো তোমার জীবন সাথী! আল্লাহ তোমাকে এই সুন্দর যুবকের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।'

'দেখো, তুমি যেমন বলছো, তেমন সুন্দর আমি নই।' সিপাহী বললো, 'কেন মিথ্যে আমাকে ধোঁকা দিচ্ছো? তোমার আসল উদ্দেশ্য কি বলো তো?'

'একমাত্র আল্লাহই জানেন, আমার অন্তরে কি ঝড় বইছে!' মেয়েটি বললো, 'যদি তুমি আমার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করো, তবে আমার জীবন সম্পর্কে আমাকে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মনে রেখো, আমি আর আমার স্বামীর কাছে ফিরে যাবো না। তুমি আমাকে নিরাশ করলে আমি সোজা নদীর দিকে ঘোড়া ছুটাবো। এই অশ্বসহ আমি ঝাঁপিয়ে

পড়বো নদীতে। পরে আল্লাহর কাছে গিয়ে বলবো, এই যুবক আমার হত্যাকারী।'

এ সৈনিক সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নয়, আলী বিন সুফিয়ান বা তকিউদ্দিনও নয়। সে এক সাধারণ সৈনিক! তার পেশীবহুল পেটা শরীরে যৌবনের জোয়ার, কিন্তু মরুভূমির হাহাকার ছাড়া এ জীবন আর কিছুই পায়নি। না একটু আনন্দ, না একটু সুখ। তার এ নিরানন্দ জীবনে অপ্রত্যাশিত আনন্দ যদি এসেই যায়, সে তা পায়ে ঠেলবে কিসের জোরে? কোত্থেকে পাবে সেই মনোবল আর শক্তি?

মেয়েটির অসহ্য যৌবন, লাবন্যময় সৌন্দর্য সুষমা এবং আবেগদীপ্ত কথা তাকে একেবারে বশীভূত করে ফেললো। সে বললো, 'দেখো, আমি এক সাধারণ সিপাই আর তুমি শাহজাদীর মত অনন্যা। মখমলের বিছানা ছেড়ে আমার সঙ্গে এই বালির বিছানায় তুমি কেমন করে বাঁচবে?'

'মখমলের বিছানা আর ধন-সম্পদ কখনো কোন নারীর কষ্ট দূর করতে পারে না। যদি তাই হতো তবে আমার স্বামীর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কেউ হতে পারতো না। তিনি আমার পদতলে তার সমস্ত ধন-সম্পদ ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু আমি যে অসহ্য যৌবন যন্ত্রণা ভোগ করছি, সম্পদ দিয়ে কি এ যন্ত্রণার উপশম হবে? বালি দিয়ে নদীর জোয়ার আটকানো যায়, কিন্তু সম্পদ দিয়ে যৌবন জোয়ার বাঁধা যায় না।

জীবনভর স্বপ্ন দেখেছি কোন সৈনিকের ঘরণী হওয়ার। আমার বাবা সৈনিক, বড় দুই ভাইও। তারা দামেশকে সালাহউদ্দিন

আইয়ুবীর সেনাবাহিনীতে কর্মরত আছেন।
আমাকে এই বৃদ্ধের হাতে তুলে দিয়েছে আমার মা। হরিণের দুশমন তার নরম গোশ্ত, আর গরীব ঘরের সুন্দরী মেয়েদের দুশমন তার রূপ-যৌবন। নইলে কি আর বাবার বয়সী বুড়ো আমাকে কিনে আনতো!
আমার স্বামী জানে না, আমি ভাল ঘোড়া চালাতে জানি। কিন্তু অশ্ব চালনায় সেনাবাহিনীতে আমার বংশের যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মান রয়েছে। আমারও সাধ ছিল, আমি সুলতান আইয়ুবীর সেনা দলে ভর্তি হবো। যদি তা সম্ভব না হয় তবে কোন সৈন্যের স্ত্রী হয়ে সে সাধ মিটাবো।
তুমি বালির কথা বলেছো, আমি এই বালি ও পাথরের উপরেই জন্ম নিয়েছি। বেড়ে উঠেছি বালির ওপর খেলা করতে করতে, আবার এই বালিতেই একদিন আমার রক্ত-মাংস মিশে যাবে। আমার সব সুখ-আনন্দ তো এই বালিতেই লুকিয়ে আছে!'
'কিন্তু আমি তোমাকে কেমন করে সাহায্য করবো?' চিন্তিত কণ্ঠে সিপাইটি বললো।
'চলো, ফিরে যেতে যেতে কথা বলি।' মেয়েটি বললো, 'এতক্ষণে দলের লোকেরা নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজতে বেরিয়ে গেছে। যেতে যেতেই বলবো, আমি কি প্ল্যান নিয়েছি।'
দু'জন যাত্রা করলো। মেয়েটি বলতে লাগলো, 'আমি তোমাকে এ কথা বলবো না যে, আমাকে তুমি সাথে নিয়ে চলো। এটা বলা অন্যায় হবে। আগে আমাকে আমার স্বামীর

কাছ থেকে মুক্ত হতে হবে। তাকে তালাক দেয়া সম্ভব নয়, সে শক্তি বা ক্ষমতা আমার নেই। তার হাত থেকে বাঁচার একটিই পথ, কৌশলে তাকে হত্যা করা। এটা এমনভাবে করতে হবে, যাতে তাকে হত্যা না বলে স্বাভাবিক মৃত্যুই মনে হয়। না, ভয় পেয়ো না, এ হত্যাকাণ্ড তোমাকে করতে হবে না। যা করার আমিই করবো।'

'তুমি মেয়ে মানুষ, তুমি কেমন করে তাকে হত্যা করবে?' বিস্মিত হয়ে বললো সৈনিক।

'ভয় পেয়ো না, দেখো, আমি তা ঠিকই পেরে যাবো। তাকে যখন মদ পান করাবো তখন তার সাথে একটু বিষ মিশিয়ে দেবো। এরপর তাকে নিয়ে যাব নদীর তীরে। নেশার ঘোরে টলতে টলতে সে যখন পথ চলবে তখন সুযোগ বুঝে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেবো।

দম আটকে সে মারা গেলে আমি চিৎকার করে লোকজনকে ডাকবো 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে। লোকজন যখন তাকে উপরে তুলে আনবে ততক্ষণে সব শেষ। আমি বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়বো।

লোকজনকে বলবো, 'মদ খেয়ে তিনি আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। নদীর ধার দিয়ে হাঁটছিলাম আমরা। হঠাৎ মাথা ঘুরে তিনি নদীতে পড়ে গেলেন। আমি চিৎকার করে তোমাদের ডাকলাম, কিন্তু তোমরা তাকে আর জীবিত তুলতে পারলে না।'

ব্যাস, সবাই আমার কথা বিশ্বাস করবে। কারণ এখনো মাঝে

মধ্যে আমরা এভাবে হাঁটতে বেরোই।
এরপর হয়তো কিছুদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আমরা একদিন বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবো।'
'তোমার কাছে কি কোন বিষ আছে?' সিপাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো।
মেয়েটি হো হো করে হেসে উঠলো। বললো, 'তুমি বোকা সিপাই। আমরা কায়রো থেকে দূরে এই নীলনদের পাড়েই বাস করি। সেখান দিয়ে এই নদী কুলকুল বয়ে চলেছে। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য এই মাছ। মাছের পিত্ত বিষে পূর্ণ থাকে।
তুমি তো দেখেছ এখানেও আমরা মাছ ধরে রান্না করে খেয়েছি। আমি মাছের পিত্তের বিষ কয়েক ফোটা শিশিতে ভরে রাখবো। তারপর তা বুড়োর শরাবের সাথে মিশিয়ে দেব।'
'কিন্তু দলের লোকেরা তোমাকে আমার সাথে বিয়ে দেবে কেনো?' যুবক জিজ্ঞেস করলো।
'সে মরে গেলেই আমি মুক্ত হয়ে যাব। পরে ওরা আমাদের বিয়েতে বাঁধা দিতে আসলে বলবো, 'তোমরা কেউ আমার অভিভাবক নও। নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করার বয়স আমার হয়েছে।' তখন কেউ আর কোন বাঁধা দিতে পারবে না। শেষে আমার সিদ্ধান্তই কার্যকরী হবে, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যাবে।'

'তোমাকে আমি কোথায় খুঁজে পাবো? তোমরা তো আর ততদিন এখানে থাকবে না।'

'শোন, এখানে আমরা আরো কয়েকদিন থাকবো। বুড়োকে আমি এখানেই খুন করবো। তখন তোমাকে অনুরোধ করবো আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। তুমি আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেয়ার সুযোগে চিনে আসবে আমাদের বাড়ী। আর শোন! যে কদিন এখানে থাকি আমার সঙ্গে নিয়মিত দেখা করবে।'

'আমি তো শুধু ডিউটির সময় এখানে আসতে পারবো।' সিপাইটি বললো, 'আমাদের সেনা ক্যাম্প এখান থেকে অনেক দূরে। ডিউটির সময় ছাড়া আমরা ঘোড়া ব্যবহার করতে পারি না।'

'আবার কখন ডিউটি পড়বে তোমার?'

'আমার ডিউটি এই সঙ্গীর সাথেই আগামী কাল মধ্যরাতে। তখন আমি তোমার সাথে দেখা করতে পারবো।'

'তোমরা আমাদের ক্যাম্পে এসো না। বাগানের বাইরে যে বড় বট গাছটি আছে তার নিচে অপেক্ষা করো। আমি ওখানেই তোমার সাথে দেখা করবো। তারপর তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবো, যেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না। সেখানে দু'জনে বসে প্রাণ খুলে কথা বলবো, কেউ জানতে পারবে না আমাদের এই গোপন অভিসারের খবর।'

চলতে চলতে মেয়েটি সৈনিকের হাত চেপে ধরলো। সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে তাকালো তার দিকে। মেয়েটি তার চোখ সেন্ট্রির চোখে গভীর ভাবে গেঁথে দিল। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে

সিপাহীর আর কোন সন্দেহ রইলো না, এ মেয়ে সত্যি তার প্রেমে পড়ে গেছে।
সে মেয়েটির হাতে চুমু খেয়ে গভীরভাবে তা বুকে চেপে ধরলো।

টিলার মোড় ঘুরেই ওরা কাফেলার লোকজনকে দেখতে পেল। লোকগুলো তাদের খুঁজতে যাচ্ছিল, দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলো তাদের কাছে। ওরাও ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলো দু'জন।
মেয়েটির বৃদ্ধ স্বামী গিয়ে জড়িয়ে ধরলো সিপাইকে। ভয়ে তখনো তার গলার স্বর কাঁপছে। অন্যরাও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো।
মেয়েটি বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথাই বললো ওদের। লোকজনকে শোনালো তাকে উদ্ধার করার এক লোমহর্ষক কাহিনী। বললো, 'এই সিপাই নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে উদ্ধার করতে ঝাঁপিয়ে না পড়লে আমার কপালে নির্ঘাত মরণ লেখা ছিল।
ঘোড়াটি যখন আমাকে নিয়ে পাহাড়ী খাদে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল ঠিক সে সময় এই বীর সিপাই তার ঘোড়া নিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। ফলে ঘোড়াটি আর লাফিয়ে পড়তে পারেনি, কিন্তু তার ধাক্কায় সৈনিকটির ঘোড়ারই এক পা খাদে পড়ে গিয়েছিল, আরেকটু হলেই জীবন সাঙ্গ হতো এ যুবকের।'

ডিউটি শেষে দুই সিপাই সেনা ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে। একজন বললো, 'দোস্ত, আজ যা দেখালি না তুই! মেয়েটা যেভাবে তোর গুণ গাইছিল, মনে হয় তোর জন্য দিওয়ানা হয়ে গেছে। আসলে কি ঘটেছিল রে?'
অভিযোগ অস্বীকার করলো না সিপাই। মোটামুটি খুলেই বললো সবকিছু। তার প্রতি মেয়েটির আকর্ষণের কথাও স্বীকার করলো। কিন্তু বুড়োকে খুন করে তারা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে, এ কথাটুকু বললো না।
বন্ধুর কথায় উৎসাহিত হয়ে সেও তাকে শোনালো নতুন এক কাহিনী। বললো, 'তোমরা যখন টিলার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেলে তখন আমরা সবাই সেদিকে তাকিয়ে আছি, একটি মেয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো।
সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়েছিল তোমাদের হারিয়ে যাওয়া পথের দিকে, মেয়েটি তাকিয়েছিল আমার দিকে। বুড়ো বললো, 'চলো এগিয়ে দেখি।'
বুড়োর কথায় লোকজন এগুতে শুরু করলে মেয়েটি আমাকে বললো, 'আপনি যাবেন না?'
আমি বললাম, 'হ্যাঁ, চলো।'
সবাই এগিয়ে যাচ্ছিল, আমরাও হাঁটা ধরলাম। মেয়েটি খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিল। লোকেরা আমাদের পিছনে ফেলে অনেক দূরে এগিয়ে গেল। অন্য মেয়ে দুটোও সামনে চলে গিয়েছিল। মেয়েটি আমার সাথে কথা বলতে গিয়ে এক পর্যায়ে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করলো। আমাকে জিজ্ঞেস করলো,

'আবার কবে দেখা হবে?'
আমি তাকে বলেছি, 'আগামী কাল মধ্যরাতে আবার আমার ডিউটি পড়বে এখানে।'
'মেয়েটি কি বলে প্রেম নিবেদন করলো রে?'
'মেয়েটি বললো, তাকে এক বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয়া হয়েছে। এই বৃদ্ধকে সে চায় না। সে আমার সাথে পালিয়ে গিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধতে চায়।'
দু'জনের ঘটনা প্রায় একই রকম। তারা দু'জনেই এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো। কেমন করে এ মেয়েদের পাওয়া যায়, এই তাদের চিন্তা।
তারা ঠিক করলো, যদি মেয়েরা তাদের স্বামীকে হত্যা করতে না পারে তবে তারা নিজেরাই তাদের হত্যা করবে। কিন্তু কেমন করে হত্যা করবে তার কোন সুরাহা করতে পারলো না।
দুই সিপাই রঙিন স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে তাদের ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছলো। ক্যাম্পে গিয়ে তারা কমাণ্ডারের কাছে রিপোর্ট দিল, 'অমুক স্থানে কায়রোর এক বণিক কাফেলা ক্যাম্প করেছে। তাদের আসবাবপত্র ও মালামাল চেক করে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, তারা প্রকৃতই ব্যবসায়ী, কোন সন্দেহভাজন বা শত্রু দল নয়।'
সৈন্যরা কাফেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বণিকদের সুন্দরী মেয়ে চারটির কথাও বললো।
ক্যাম্পের কমাণ্ডার আগের রিপোর্ট তেমন মনোযোগ দিয়ে

শোনেননি। কিন্তু মেয়েদের কথা বলতেই তিনি এদিকে মনোযোগী হলেন। তিনি প্রশ্ন করে মেয়েদের সংখ্যা, বয়স, রূপ, গঠন, গায়ের বর্ণ, আকৃতি সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনলেন। সিপাইরা তার মনের ভাব বুঝতে পেরে চুপ করে রইলো।

কমাণ্ডারের কাছে বসেছিল একজন অপরিচিত সৈন্য। সে এই ক্যাম্পের লোক নয়, পাশের ক্যাম্পের। ওই ক্যাম্পটি এখান থেকে আট দশ মাইল দূরে। সে তার কমাণ্ডারের কাছ থেকে এ ক্যাম্পের কমাণ্ডারের জন্য জরুরী চিঠি নিয়ে এসেছে। চিঠিতে আজ সন্ধাতেই ওই ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে এ ক্যাম্পের কমাণ্ডারকে। বলা হয়েছে, 'বিশেষ কাজ আছে, অবশ্যই চলে আসবেন।'

কমাণ্ডার চিঠি বাহককে বললো, 'একটু অপেক্ষা করো, যাবো যখন দু'জনে এক সাথে যাওয়াই ভালো।'

এইমাত্র সূর্য ডুবলো। মাগরিবের নামাজ পড়েই কমাণ্ডার আগত সৈনিকটিকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলো।

যখন তারা অপর ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছলো তখন নিকষ রাতের আঁধার সারা প্রকৃতিকে জড়িয়ে নিয়েছে।

এই ক্যাম্পটি ছিল খুবই সুন্দর জায়গায়। এক কমলার বাগানের ভেতর। পাশেই ছিল শস্য শ্যামল বাগান ও ক্ষেতখামার।

সন্ধ্যার পর পরই আলোকমালায় সাজানো হলো ক্যাম্প।

রাতের জন্য ক্যাম্পের সৈন্যদের অবকাশ দেয়া হলো ডিউটি থেকে। সবাই আনন্দ উৎসব শুরু হওয়ার আশায় একস্থানে জটলা করে বসেছিল।

মশালের আলোয় স্থানটি আলোকিত হয়ে উঠেছে। ক্যাম্পের কমাণ্ডার জটলার কাছে নেই। তিনি আসেননি বলেই এখনো শুরু হয়নি অনুষ্ঠান।

আগত কমাণ্ডার এখানকার দায়িত্বশীলের সাথে দেখা করার জন্য ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে গেলো। দেখলো, কমাণ্ডারের সামনে বসে আছে দু'জন মেয়ে ও তিনজন মরুচারী বেদুইন। তাদের পাশে পড়ে আছে বাজনার সাজ-সরঞ্জাম ও তবলা।

মেহমানরা সবাই এসে পৌঁছলে কমাণ্ডারের নির্দেশে খানা পরিবেশন শুরু হলো। খাওয়া শেষ হলে কমাণ্ডার মেহমানদের উদ্দেশ্যে বললো, 'বাইরে চলুন সবাই। আপনাদের জন্য আরো কিছু আপ্যায়নের ব্যবস্থা আছে।'

মেহমানরা বাইরে এলো। বাইরের খোলা মাঠ মশালে মশালে আলোকিত করে তোলা হয়েছে। মেহমানদের জন্য এক পাশে বিছানো হয়েছে ফরাশ।

কমাণ্ডার তার এক সৈন্যকে বললো, 'বাজনাদার ও মেয়েদের নিয়ে এসো।'

বাজনাদার ও মেয়েরা এলে এক মেহমান জিজ্ঞেস করলো, 'এ লোকগুলো কারা, এখানে কি হচ্ছে?'

'এই মেয়েরা নর্তকী ও গায়িকা।' কমাণ্ডার উত্তর দিল, 'এদের সাথে বাজনাদারও আছে। এদিক দিয়েই যাচ্ছিল ওরা। পানি

পান করার জন্য এখানে থামলে আমি এদের পরিচয় পেয়ে থামিয়ে দিলাম। বললাম, আজ রাতে এখানেই থেকে যাও। আমার সৈন্যদের জীবন একঘেঁয়ে হয়ে উঠেছে, ওদের একটু আনন্দ দিয়ে যাও।'

'আমার কিন্তু এসব ভাল লাগছে না।' মেহমান কমাণ্ডারকে বললো, 'সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত সিপাইদের আমোদ-স্ফূর্তিতে ডুবিয়ে দিলে তাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে, দায়িত্বে অবহেলা আসবে।'

'এ ছাড়াও সৈন্যরা নষ্ট হচ্ছে।' মেজবান কমাণ্ডার বললো, 'আমাদের অন্য সাথীরা আজ শহরে আরাম-আয়েশে জীবন কাটাচ্ছে। আর আমরা বেওয়ারিশ কুকুরের মত মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোমাকে কি তোমার সিপাইরা উত্যক্ত করে না? বলে না, এখানে থাকবো না, আমাদের অন্যত্র বদলী করে দিন?'

মেহমান বললো, 'সিপাইদের মাথায় চড়ার সুযোগ দিতে হয় না, ওদেরকে সৈনিকের মতই রাখতে হয়।'

'আমি তো আমাদের সেনাপতির কাছেও আবেদন করেছি, 'আমাদের ওপর একটু দয়া করুন, আমাদের অন্য কোথাও বদলী করুন।' মেজবান কমাণ্ডার বললো, 'তিনি এখনো তার কোন উত্তর দেননি। আমি আরও বলেছি, 'আমাদের সেই সেক্টরে পাঠিয়ে দিন, যেখানে কঠিন লড়াই হচ্ছে। নিষ্কর্মা জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছে এখানকার সৈন্যরা, এদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দিন। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি,

এখন অন্যদের পাঠান।'
মেহমান কমাণ্ডারও ঠিক এই বিষয়টিই চিন্তা করছিলেন। কমাণ্ডারের সামান্য ভুল ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। শত্রুদের উপরে বিদ্যুতের মত ঝাঁপিয়ে পড়া মুজাহিদরা এখন মানসিক বিষণ্নতায় ভুগছে, এটা ভাল কথা নয়। ডিউটি ফেলে তারা নাচ-গান ও স্ফুর্তিতে ডুবে গেলে সীমান্ত রক্ষা করবে কারা, কারা প্রতিরোধ করবে চোরাচালানী ও বিদেশী দুস্কৃতকারী?

রাত ক্রমশ: বেড়ে চলেছে। পালাক্রমে নাচছে মেয়েরা। তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে বাজনাদাররা গান শুনিয়ে সাময়িক বিশ্রাম দেয় ওদের।
আবারো একটি মেয়ে উঠে দাঁড়ালো। নৃত্যের তালে তালে উন্মাতাল বাজনা বাজছে। উল্লাসে ফেটে পড়ল সৈন্যরা। চিৎকার করে নাচের প্রশংসা করছে ওরা। আনন্দে টাকা পয়সা ছুঁড়ে মারছে।
কিন্তু মেয়েরা নাচ থামিয়ে হাত জোড় করে এই বলে ক্ষমা চাইল, 'মাফ করবেন আমাদের। নাচ আমাদের নেশা এবং পেশা। কিন্তু যারা দেশের জন্য জীবন বাজি রেখে সীমান্ত পাহারা দেয় তাদের একটু আনন্দ দেয়ার পরিবর্তে আমরা কোন মূল্য গ্রহণ করতে পারবো না। আপনাদের দেখে আমাদের মধ্যে যে দেশপ্রেম জেগে উঠেছে, টাকা পয়সা দিয়ে আমাদের সেই দেশপ্রেমকে অপমান করবেন না

আল্লাহরওয়াস্তে।'
বাজনাদাররাও বাজনা থামিয়ে বলে উঠলো, 'দেশরক্ষা বাহিনী যদি আমাদের নাচগানে খুশী হন, এটাই আমাদের বড় পাওয়া। দেশের জন্য আমরা কিছু করতে না পারি, দেশ রক্ষায় নিয়োজিত ভাইদের একটু সেবাও কি করতে পারবো না?'
দলের সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি আমার যন্ত্রী ও নর্তকীদের দেশপ্রেম দেখে অভিভুত। আমি ঘোষণা করছি, আপনাদের যখন ইচ্ছা আমাদের ডেকে পাঠাবেন, এর জন্য কখনো কোন মূল্য দিতে হবে না আপনাদের।'
উপস্থিত সৈনিকরাও অভিভুত হলো ওদের এই আন্তরিকতা দেখে।
এখানে দর্শকদের মধ্যে বসে ছিল দুই ক্যাম্পের দুই সামরিক কমাণ্ডার। তাদের পদমর্যাদা যদিও তেমন উচ্চ নয়, তবুও তারা একেকটি ক্যাম্পের ইনচার্জ।
দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে যে দুরদর্শিতা ও সতর্কতা প্রয়োজন তার কিছুই তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। তাদের মনে দায়িত্বের কোন অনুভূতি আছে, এমনটিও মনে হচ্ছিল না তাদের আচরণে।
এই দায়িত্বশীল কমাণ্ডাররা এ কথা খতিয়ে দেখলো না, এই নর্তকী ও বাজনাদারেরা আসলে কারা? এরা কোত্থেকে এসেছে আর কোথায় যাবে? বাজনাদাররা যে পরিচয় ও বক্তব্য দিয়েছে, সে বক্তব্য কতটুকু সত্য ও গ্রহণযোগ্য? তাদের এই

আগমন কোন ষড়যন্ত্রের অংশ কিনা তাও খতিয়ে দেখার চেষ্টা করলো না। এমনকি বেদুঈন পোষাকে দর্শকের মধ্যে কিছু বহিরাগত লোক বসেছিল, এই লোকগুলো কারা এবং কোত্থেকে এসেছে তাও তলিয়ে দেখার কথা ভাবলো না এই কমাণ্ডাররা।

যে কোন অবস্থায় ক্যাম্পের সেন্ট্রিবক্সে চারজন পাহারাদার থাকে। কিন্তু কখন যে তারা সেন্ট্রিবক্স ছেড়ে নাচের আসরে চলে এসেছে এ খবরও হয়তো জানে না কমাণ্ডার। অথবা জানলেও নাচ দেখায় তারা এতটাই বিভোর, ও নিয়ে কিছু চিন্তা করার মত সময় ছিল না তাদের।

ক্যাম্পের কিছু দূর দিয়ে রাতের আঁধারে কালো বর্ণের কমবেশী পঞ্চাশজন লোক একে অন্যের পিছনে লাইন দিয়ে সুদানের দিক থেকে এগিয়ে এলো। এদের আগে আগে যাচ্ছে দু'জন লোক। পিছনের লোকেরা এদের অনুসরণ করছে এবং এদের ইঙ্গিতে কখনো থামছে, কখনো এগিয়ে যাচ্ছে।

ইঙ্গিত পেয়ে লোকগুলো থামল। সামনের দু'জন আঁধারে এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে দেখলো। রাতের নিরবতার মাঝে কোথায় কি শব্দ হচ্ছে শোনার চেষ্টা করলো ওরা। এরপর শেয়ালের লম্বা ডাক ছাড়লো। এ ডাকের অর্থ কি কাফেলার লোকেরা তা বোঝে। পেছনের লোকগুলো এ শব্দ শোনার সাথে সাথে আবার সামনে অগ্রসর হতে থাকলো।

আবার সামনে থেকে শিয়ালের হুক্কা হুয়া শব্দ ভেসে এলো।

থেমে গেলো লোকগুলো। আবার কিছুক্ষণ পর শিয়ালের সেই লম্বা ডাকে চলতে আরম্ভ করলো।

দূর থেকে ক্যাম্পের নাচগান ও বাজনার অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ওরা। সামনেই পাহাড়ী এলাকা। কালো রাতের অন্ধকারে ঘোর কালো ছায়াগুলো সেই পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাদের হাতে ছিল বর্শা, সঙ্গে তলোয়ার ও খঞ্জর। এ ছাড়াও ছিল চার পাঁচটি করে ধনুক এবং প্রচুর তীর।

আফ্রিকান বংশোদ্ভুত এই জংলী নিগ্রোদের স্বাগত জানানোর জন্য পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়েছিল তিন চারজন অভ্যর্থনাকারী। একজন এগিয়ে এসে আগত দলের সরদারকে বললো, 'তাহলে ঠিক মতই আসতে পেরেছেন। যাক, মেয়েরা ভালই কাজ দেখাতে পেরেছে।'

'হ্যাঁ!' সরদার বললো, 'আমিও তাদের বাজনার সুর ও নাচের ঝংকার শুনতে পেয়েছি। দশ-বারো জনকে আমি সেখানে দর্শক হিসেবে পাঠিয়েছিলাম। তাদের একজন এসে সংবাদ দিল, 'মাহফিল খুব জমে উঠেছে, এখন রাস্তা একদম ফাঁকা। সমস্ত প্রহরী ও সৈনিক আসরে চলে গেছে।' এ খবর পেয়ে আর দেরী করিনি, সাথে সাথে চলে এসেছি।'

'নীল নদের পাড় থেকেও ভাল সংবাদ পাওয়া গেছে।' অপর এক অভ্যর্থনাকারী বললো, 'ওখানকার মেয়েরাও কাজ গুছিয়ে নিতে পেরেছে। আগামী কাল রাতে যে দু'জন সেন্ট্রি পাহারায় আসবে তাদরেকে এরই মধ্যে ফাঁসিয়ে নিয়েছে ওরা। আমি

সংবাদ পাঠিয়েছি, আগামী কাল রাতে কমপক্ষে তিনটি বিশাল নৌকা বোঝাই করে আমাদের লোকেরা যেনো চলে আসে।'

তারা সামনে এগিয়ে চললো। পাহাড় ক্রমশ: উঁচুতে উঠে গেছে। বেশ কিছুটা পথ উঠার পর সরদার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। সাথে সাথে দলের সবাই দাঁড়িয়ে গেল। এরপর আরেক দল লোক এসে ওদের পাহাড়ের অভ্যন্তরে ফেরাউনের তৈরী যে অসংখ্য গুহাঘর ছিল ওখানে নিয়ে গেল। চারদিকে পাহাড়ের অভ্যন্তরে অসংখ্য গুহাঘর, মাঝখানে বিশাল এক মাঠ। সবাইকে নিয়ে হাজির করা হলো সে মাঠে।

দলের সরদার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল নেতৃস্থানীয়দের সাথে। যেতে যেতে সরদার বললো, 'আপনারা ভুলে যাবেন না, এরা সবাই কুসংস্কার ও পূজা-পার্বনে বিশ্বাসী। এরা কোন উদ্ভট ও হাস্যকর আচরণ করলে বিস্মিত হবেন না, বরং সেগুলোকে সম্মানের চোখে দেখবেন।

আমরা তাদেরকে ধর্মের নামে ডেকে এনেছি। তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়েছি, তোমাদেরকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবো, যেখানে ভগবান স্বয়ং বাস করেন। যে ভগবান বালিকে গরম রাখেন, সূর্যকে উত্তপ্ত করেন, আকাশ থেকে পানি ও বিজলী বর্ষণ করেন।'

'এ নিয়ে ভাববেন না আপনি। কোন সমস্যা হবে না।'

'সমস্যা একটা আছে। এ সব লোকেরা কোন অভিযানে বেরোনোর আগে ভগবানের নামে মানুষ কোরবানী দিয়ে

অভ্যস্ত।'
'কোরবানী কি পুরুষ দিতে হবে, না নারী? নাকি নারী ও পুরুষ উভয়কেই দিতে হবে?'
'মানুষ হলেই চলবে। যদি আমরা তাদের এই প্রথা পূরণ করি তবে তারা নিঃশঙ্ক চিত্তে লড়াই করতে পারবে। তারা তখন এমন বেপরোয়া হয়ে যায় যে, কোন বাঁধাকেই পাত্তা দেয় না। কায়রো শহরে ওরা একবার ঢুকতে পারলে ইট দিয়ে ইট ভাঙবে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ওদের সামনে একদিনের বেশী টিকতে পারবে না।'
মাঠে পৌঁছলো সরদার ও নেতৃবর্গ। সরদার সামনে দণ্ডায়মান নিগ্রো বাহিনীকে বললো, 'তোমরা সিজদায় পড়ে যাও। কারণ তোমরা এখন ভগবানের ঘরে এসে গেছো।'
সবাই সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় পড়ে গেল। একটু পর সরদারের আদেশে আবার তারা উঠে দাঁড়ালো।
এ দলটি ছিল সুদানের হাবশী ক্রীতদাসদের। এদের মিশরে প্রবেশ করানো হচ্ছিল নাশকতামূলক কাজের জন্য। সীমান্ত রক্ষীদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে এদের মিশর অনুপ্রবেশ নিশ্চিত করার জন্যই নীলনদের পাড়ে বাণিজ্য কাফেলা এবং এখানে নর্তকী ও গায়ক দলের সমাবেশ ঘটানো হয়। অনুপ্রবেশের জন্য বেছে নেয়া হয় সেই দুর্গম ফেরীঘাট, যা পার হয়ে সামান্য এগুলেই অভিশপ্ত পার্বত্য অঞ্চলের ভয়ানক ও বিস্তৃত এলাকা অবস্থিত।
এলাকাটি ভীষণ দুর্গম এবং ছোট বড় অসংখ্য পর্বতমালায়

সজ্জিত। এখানে আছে ফেরাউনের যুগের পর্বত গহ্বর, যেখানে মাটির নিচে ফেরাউনের তৈরী মহলের অসংখ্য ছোট বড় কামরায় বিরাট সৈন্য দল, ঘোড়া ও উটের বহর অনায়াসে লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

সুদানের এই নিগ্রো হাবশীরা রক্তের হোলি খেলায় ছিল ওস্তাদ। মানুষকে তারা পশুর মতই এক প্রকার জন্তু ভাবতো। পশু শিকারের মতই মানুষ শিকারেও ওরা ছিল সিদ্ধহস্ত।

মিশরে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এদের সর্বাত্মক ও গেরিলা প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হলো এই দুর্গম পাহাড়ের অভ্যন্তরে।

এমনিতেই যুদ্ধে তারা খুবই পারদর্শী। তাদের মধ্যে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ লেগেই থাকে। এ জন্যই তীরন্দাজী ও বর্শা নিক্ষেপে এদের জুড়ি পাওয়া ভার।

সুদান সরকার খৃস্টানদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে অনেক খৃস্টান সৈন্য ও সামরিক অফিসারকে তাদের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। এরাই সুদানী হাবশীদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলছে।

এর আগে সুদানী বাহিনী মিশরীয় বাহিনীর কাছে দু'বার পরাজিত হয়েছে। তৃতীয়বার সুলতান আইয়ুবীর ভাই তকিউদ্দিন সুদানের ওপর আক্রমণ চালালে সুদানীরা সে আক্রমণ প্রতিহত করে।

তকিউদ্দিনের সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে মরুভূমিতে ছড়িয়ে পড়লে

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী দ্রুত তাদের সাহায্যে এসে কোন রকমে অবশিষ্ট সৈন্যদের ফিরিয়ে এনেছিলেন।
তকিউদ্দিনের বাহিনীর এই বিপর্যয়ের পরও সুদানীরা মিশরীয়দের পিছু ধাওয়া করা বা মিশর আক্রমণের সাহস করেনি। ঐতিহাসিকদের মতে, যদি তখন সুদানীরা মিশর আক্রমণ করতো তবে তকিউদ্দিনের পক্ষে মিশর রক্ষা করা কঠিন হয়ে যেত।

বারবার ব্যর্থতার কারণে খৃস্টানরা যুদ্ধের পদ্ধতি পরিবর্তন করলো। তারা সুলতান আইয়ুবীর মত গেরিলা যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে লাগলো। তারা দেখলো, সুলতান আইয়ুবীর অল্প সংখ্যক কমাণ্ডো বিশাল বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তছনছ করে দেয় তাদের। ওরা সামনাসামনি যুদ্ধ করে না, চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে মুহূর্তে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু এই অল্প সময়েই আক্রান্তরা সম্মুখীন হয় বিপুল ক্ষতির।
এ ধরনের আক্রমণের জন্য দরকার বাছাই করা সৈন্য এবং পর্যাপ্ত ট্রেনিং। সাধারণ সৈন্যরা সামনাসামনি দল বেঁধে যুদ্ধ করতে পারলেও এ ধরনের ঝটিকা আক্রমণে সুবিধা করতে পারে না। এ জন্যই সুদানীরা হাবশীদের নিয়ে এই নতুন বাহিনী গড়ে তোলার জন্য তৎপর হলো।
এদের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা আছে, আছে ক্ষিপ্রতা ও অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার ট্রেনিং। এই ট্রেনিং আরেকটু শানিয়ে

নিলে এরা হবে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তারা কায়রোবাসীদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালালে হয়তো কায়রো দখল করা সম্ভব হতে পারে। কারণ এখন সুলতান আইয়ুবী মিশরে নেই।

এই সুবর্ণ সুযোগ ব্যবহারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল সুদানীরা। তাদের বিশ্বাস, সুলতান আইয়ুবীর অবর্তমানে তাদের এ আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা মিশরে আর কারো নেই। তারা অনায়াসেই কেল্লা ফতেহ করে নিতে পারবে।

তারা আরো ভাবল, যদি এ আক্রমণের নেতৃত্ব মিশরের কোন গাদ্দার সেনাপতির হাতে দেয়া যায়, তবে সে ভাল করেই জানবে কোথায় কেমন করে আঘাত হানলে সহজে বিজয় অর্জন সম্ভব। অল্প সময়ে, অল্প শক্তি ব্যয় করে বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য তারা সুলতান আইয়ুবীর বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ সেনাপতি আলকিন্দিকে বাছাই করলো। আলকিন্দি সুদানীদের টোপ গিলে রাজি হয়ে গেল এই আক্রমণে নেতৃত্ব দিতে।

সুদানের হাবশী সৈন্যদের গোপন স্থানে রাখার ব্যবস্থা আলকিন্দিই করেছিল। সে মিশরের সেনাবাহিনীর চার পাঁচজন জুনিয়র কমাণ্ডারকে কৌশলে তার সঙ্গী বানিয়ে নিল। গোয়েন্দাদের মাধ্যমে সুদানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিল সে।

ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য হাবশী সৈন্যদের সে এবং তার অনুগত কমাণ্ডাররা গোপনে মিশরের মাটিতে প্রবেশ করাচ্ছিল।

সারারাত ক্যাম্পে নাচ-গানের আসর চললো। সকালে অন্য ক্যাম্পের কমাণ্ডার বিদায় নিয়ে যাত্রার সময় এই ক্যাম্পের কমাণ্ডারকে বললো, 'আগামী রাতে তোমার দাওয়াত আমার ক্যাম্পে।'

সে বাদক দল এবং নর্তকীদেরও দাওয়াত দিল এক রাত তার ওখানে থেকে যাওয়ার জন্য। বাদক দল খুশী হয়েই কবুল করলো এ দাওয়াত।

এরা ছিল আলকিন্দির প্রেরিত লোক। ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করার স্বার্থে আলকিন্দি চাচ্ছিল, সুদানী গেরিলারা সীমান্ত রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে মিশরে ঢুকে পড়ুক। তাদের অনুপ্রবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই আলকিন্দি এই ফন্দি এঁটেছিল।

এরা অন্য গ্রামে যাচ্ছিল, এটা ছিল মিথ্যা কথা। তারা আগেই প্ল্যান করে এসেছিল, ক্যাম্পের কাছে গিয়ে পানি পান করার বাহানায় তারা ক্যাম্পে ঢুকে যাবে। এরপর ক্যাম্পের লোক ও কমাণ্ডারকে জালে ফাঁসানোর চেষ্টা করবে।

এদের সাথের নর্তকী দু'জনের চেহারা ছিল খুবই আকর্ষণীয়। কমাণ্ডার দেখেই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হলো। সে এই আনন্দে শরীক হওয়ার জন্য অন্য ক্যাম্পের কমাণ্ডারকেও আমন্ত্রণ জানালো। আর এই আনন্দ উৎসবের সুযোগে পঞ্চাশজন সুদানী হাবশী নিগ্রো সীমান্ত পার হয়ে মিশরের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করলো।

পরের দিন। সন্ধ্যার পর পর নর্তকী ও বাদক দল নদীর

পাড়ের ক্যাম্পে গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখানেও নাচ-গানের আসর জমজমাট করে তুললো ওরা।

রাতের দ্বিপ্রহর। নদীর পাড়ে পাহারা দিতে রওনা হলো দুই সিপাহী। সঙ্গীরা বললো, 'এমন আসর ছেড়ে ডিউটিতে গিয়ে কি লাভ? থাক না আজ ডিউটি।'

কমাণ্ডার তখন রূপসী নর্তকীদের নিয়েই মহা ব্যস্ত। কে ডিউটিতে যাচ্ছে, আর কে আসছে সে দিকে তার কোন খেয়াল নেই।

কিন্তু তারা এই বলে যাত্রা শুরু করলো, 'তোমরা মউজ করো। আমাদের কপাল মন্দ, কি আর করা! ডিউটিতে অবহেলা করে কমাণ্ডারের গালমন্দ খেয়ে কি লাভ?'

আর মনে মনে বলছিল, 'তোমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাও, দুধটুকু আমরাই খেয়ে আসি।'

ওদের জন্য যে এর চেয়েও আকর্ষণীয় আসর পড়ে আছে, সে কথা কাউকে বললো না।

মধুর স্বপ্ন দেখতে দেখতে এগিয়ে চললো দুই সিপাহী। বুকের মধ্যে সেই সুন্দরী মেয়েদের ছবি, যারা কাল প্রেম নিবেদন করেছে ওদের কাছে। ওরা বলেছে, তাদের দু'জনেরই স্বামী বৃদ্ধ, তারা সেই বুড়ো স্বামীর হাত থেকে মুক্তি চায়। ঘর বাঁধতে চায় এই সিপাহীদের সাথে।

তাই ডিউটির গরজের চেয়ে রূপসীদের সাথে মিলিত হওয়ার গরজটাই ওদের বেশী। এই গরজই ওদের টেনে নিয়ে চললো সেই বাগানের দিকে।

এতদিন ডিউটিতে যাওয়ার জন্য তাদের তেমন তাড়া ছিল না। ধীরে সুস্থে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে পথ চলতো। কিন্তু সে রাতে দু'জন ক্যাম্প থেকে বেরিয়েই বিপুল বেগে ছুটিয়ে দিলো ঘোড়া। বনভূমির কাছে এসে নদীর পাড়ে এক জায়গায় ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়লো। ঘোড়া দু'টো বেঁধে রেখে এগিয়ে গেল দু'জন।

কোথায় ওরা মিলিত হবে আগেই বলে দিয়েছিল মেয়েরা। সে অনুযায়ী আরেকটু এগিয়ে দুই বন্ধু আলাদা হয়ে গেল। ধীর পদে এগিয়ে গেল নির্দিষ্ট জায়গায়।

সময় মতই অভিসারে বেরিয়ে আসে দুই মেয়ে। নির্দিষ্ট জায়গায় বসে সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ওরা।

নদীর পাড় থেকে সামান্য দূরে পাহাড়ের নির্জন গুহায় অভিসারে মেতে উঠলো দুই যুগল। মেয়েরা তাদের রূপ ও যৌবনের পসরা মেলে ধরল সৈন্যদের সামনে। ভালবাসার যাদুর বাণ ছুঁড়ে দিল তাদের ওপর। দু'জনেই বললো, 'ঘুমের ওষুধ মেশানো মদ খাইয়ে ঘুমে বিভোর করে রেখে এসেছি স্বামীকে। সারারাত সে আর চোখের পাতা মেলতে পারবে না। আজ সারারাত তোমার সাথে গল্প করে কাটিয়ে দেবো।'

ডিউটি ভুলে দুই সিপাই পাহাড়ের নির্জন গুহায় পড়ে রইল মোহময় আচ্ছন্নতায়। জগত সংসারের সব কিছু ভুলে ওরা যখন স্বপ্নময় জগতে, ওখান থেকে একটু দূরে, নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে গেল চারটি ছায়ামূর্তি।

কুল কুল রবে বয়ে যাচ্ছে নদীর পানি। লোকগুলো অন্ধকারের

ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে পানির ওপর। কোন কিছু অনুসন্ধান করছে ওরা।
নদীর পাড়ে ঘোরাফেরা করতে করতে অধীর হয়ে উঠল ওরা। একজন বলে উঠলো, 'এতক্ষণ তো লাগার কথা নয় ওদের আসতে!'
অন্য একজন দূরে তাকিয়েছিল। সে বলে উঠলো, 'মনে হয় ওরা আসছে! ওদিকে তাকিয়ে দেখো, ওগুলো নৌকা নয়?'
চারজনই তাকালো সেদিকে। 'হ্যাঁ, আসছে ওরা!'
জলদি করে তারা একটি লণ্ঠন জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক দোলাতে লাগলো। একটু পর নদীর মাঝেও জ্বলে উঠলো দু'টি প্রদীপ, কিন্তু সাথে সাথেই তা আবার নিভেও গেল।
কিছুক্ষণ পরেই একটি বিরাট পাল তোলা নৌকা এসে কুলে ভিড়লো। নৌকার মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বললো, 'সাবধান! কেউ কোন শব্দ করবে না।'
পরিপূর্ণ নিরবতার মধ্য দিয়ে কালো হাবশী সুদানীরা নৌকা থেকে একে একে নেমে এলো। একটু পরই তার পাশে এসে ভিড়লো আরও একটি নৌকা। সে নৌকা থেকেও নেমে এলো হাবশীরা।
দুটো নৌকাই বেশ বড়। কম করেও দুইশ হাবশী নদীর কিণারে নেমে এসেছে।
দ্রুত মাল খালাস করলো ওরা। মাল মানে, যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম ও অস্ত্রপাতি। মালখালাস হতেই মাল্লাদের বলা হলো, 'জলদি নৌকা ফিরে নিয়ে যাও।'

মাল্লারা তাড়াতাড়ি পালের রশি টেনে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে তীর থেকে দূরে সরে গেল। ধীরে ধীরে নৌকা হারিয়ে গেল অন্ধকারে। এভাবেই নৌকায় করে হাবশী সেনাদের আমদানী চলতে থাকলো। নদীর পাড়ে নেমেই ওরা দ্রুত পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল।

দুই সিপাহী ক্যাম্পে ফিরে এলো। ততক্ষণে ক্যাম্পের নাচ-গানের আসর শেষ হয়ে গেছে। রাতভর নাচ দেখে ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে নিজ নিজ তাবুতে ফিরে যাচ্ছে সৈন্যরা।
নাচ-গানের জন্য পৃথক তাবুর ব্যবস্থা করেছিল কমাণ্ডার। একটি মেয়েকে তার খুব পছন্দ হয়ে গেল। দেখতে মেয়েটি অল্প বয়স্ক ও চঞ্চল। কমাণ্ডার ভাবলো, এরা কেবল নর্তকীই নয়, নিশ্চয়ই পেশাদার নিশিকন্যাও। সে বাজনাদারকে বললো, 'এই মেয়েটিকে আমার তাবুতে পাঠিয়ে দিও।'
এরা কোন সাধারণ নাচের পার্টি ছিল না, বরং এ লোকগুলো ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। তথ্য সংগ্রহের জন্য আসেনি ওরা, তাদের মিশন ছিল, ক্যাম্পের সৈন্যদের যে কোন মূল্যে ভুলিয়ে ভালিয়ে ক্যাম্পে আটকে রাখা। যাতে সুদান থেকে হাবশী সেনারা নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করতে পারে।
তাদের আরো বলে দেয়া হয়েছিল, 'পারলে কমাণ্ডার দু'জনকে মুঠোয় নিয়ে এসো। ওরা পরেও কাজে লাগতে পারে।'
কমাণ্ডার মেয়েটাকে কাছে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই সঙ্গে সঙ্গে তার আশা পূরণ করা হলো। মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেয়া

হলো কমাণ্ডারের তাবুতে।
কমাণ্ডার ছিল মধ্য বয়সী, নর্তকী পূর্ণ যৌবনা। তাবুতে যাওয়ার সাথে সাথে মেয়েটির লাস্যময়ী ভাব ও উচ্ছ্বলতা একদম উবে গেল। যে মেয়েটি লম্ফঝম্ফ করে নেচে গেয়ে হাসি তামাশায় দর্শকের মন মাতিয়ে রেখেছিল, নিভে গেল তার দীপ্তি। যে মেয়ের মিষ্টি হাসি কেড়ে নিয়েছিল সবার মন, হারিয়ে গিয়েছিল সে হাসি।
তাবুতে তখনও প্রদীপ জ্বলছে। মেয়েটি জড়োসড়ো হয়ে তাবুর এক কোণে বসে কমাণ্ডারের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে রইল। কমাণ্ডার বললো, 'কি ব্যাপার, তুমি অমন চুপসে গেলে কেনো? আমি ডাকায় মন খারাপ করেছো?'
'আমি কখনও পান করিনা। আমার বাবাও কোন দিন মদ পান করেনি!' নর্তকী বললো।
'তুমি মদের কথা বললে কেন? আমি তো তোমাকে বলিনি, তুমি মদ পান করো?'
'যারাই ঘরে ডাকে, তারা প্রথমেই বলে, একটু পান করো সুন্দরী। তারপর বলে, আমাকে একটু ঢেলে দেবে?'
'তুমি ঠিকই বলেছো, কথায় বলে, মদ ছাড়া নারী ও নারী ছাড়া মদ একদম বিস্বাদ!' কমাণ্ডার হেসে বললো, 'তবে তুমি শুনলে অবাক হবে, আমি কোনদিন মদ পান করিনি, আর ভিন্ন নারীর স্বাদ কেমন তাও জানিনা।'
'ও, তবে তো তুমি এক আনাড়ী পাপী!' নর্তকী বললো, 'আমি একটি কথা বললে মন খারাপ করবে?'

'কি কথা?'
কথাটি হলো, 'গোনাহ করাতে যে মজা, গোনাহ্ না করার মজা কিন্তু তার চেয়েও বেশী। তুমি পুরুষ মানুষ, এই নির্জন তাবুতে আমার মত সুন্দরী মেয়ের কাছ থেকে এ কথা শুনতে হয়তো তোমার ভাল লাগবে না। হয়তো মনে মনে আশ্চর্য ও বিরক্ত হবে। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করো, তোমার চেহারাই বলছে, আজ প্রথম তুমি পাপ করার ইচ্ছা পোষণ করেছো। এতো ঠাণ্ডায়ও তোমার কপালে ঘামের ফোটা দেখা যাচ্ছে। এই যে জীবনভর তুমি পাপ থেকে বেঁচে থাকলে, এর মাঝে কি কোন প্রশান্তি নেই?'
'তুমি ঠিকই বলেছ।' মধ্য বয়সী কমাণ্ডার বললো, 'আমাকে যখন সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল, তখন পাপ থেকে বাঁচার শিক্ষাও দেয়া হয়েছিল। ট্রেনিংয়ের সময় শারীরিক প্রশিক্ষণের সাথে চারিত্রিক প্রশিক্ষণও অন্তর্ভুক্ত থাকতো। এই কারণেই তো সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী একশ সৈন্য নিয়ে ক্রুসেডদের এক হাজার সৈন্যকে রক্তে ভাসিয়ে দিতে পারতো।'
'কিন্তু এখন তোমার কাছ থেকে একজন দুর্বল মেয়ে অস্ত্র কেড়ে নিতে পারে।' নর্তকী বললো, 'তুমি তোমার এতদিনের চারিত্রিক শক্তি সামান্য এক মেয়ের হাতে তুলে দিতে চাও?'
কমাণ্ডার এ কথা শুনে অস্থির হয়ে উঠলো। সে সহসাই বলে উঠলো, 'আমি এমনটি আশা করিনি। তুমি এখানে এসে এ ধরনের কথা বলবে, ভাবিনি। আমি তো চিন্তা করেছিলাম,

তুমি এই নির্জনে এসে তোমার চঞ্চল অভিনয়ে, মান-অভিমানে আমাকে পাগল বানিয়ে দেবে। তোমার সেই হাসি, গান ও নাচের ভঙ্গি কোথায়, যা আমাকে বাধ্য করেছে তোমাকে ডাকতে?'

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে রইলো কমাণ্ডার। তারপর এক সময় মাথা তুলে বললো, 'তোমার দলের লোকদের কাছে আমি তোমাকে ভিক্ষা চাই! তোমার দলনেতাকে বলো, বিনিময়ে আমি দু'টি আরবী ঘোড়া দেবো।'

'তোমার তলোয়ারও কি দিয়ে দেবে?' মেয়েটি ব্যঙ্গ করে বললো, 'তোমার বর্শা, তোমার ঢাল, তোমার খঞ্জর অর্থাৎ তোমার সমস্ত হাতিয়ার কি দিয়ে দেবে?'

সে ব্যগ্র কণ্ঠে বললো, 'হ্যাঁ, দেবো, দেবো, সব দিয়ে দেবো!'

কিন্তু পরক্ষণেই তার সম্বিত ফিরে এলো। অশান্ত কণ্ঠে সে বললো, 'না! সিপাহী কখনও তার হাতিয়ার ছাড়া চলতে পারে না।'

সে তাবুর মধ্যেই দ্রুত পায়চারী করতে লাগলো।

হঠাৎ থেমে রাগের সাথে বলে উঠলো, 'একজন নর্তকীর মুখে এসব কথা শোভা পায় না। তুমি কি আমার হাত থেকে মুক্তি চাও? এ জন্যই কি এমন কৌশল করছো, যেন আমি তোমার শরীরে হাত না লাগাই?'

'হ্যাঁ! আমি তোমার থেকে আমার দেহ রক্ষা করতে চাই।' মেয়েটি বললো।

'কেন, তুমি কি অক্ষত? তুমি কি বলতে চাও, তোমার দেহ

এখনো পবিত্র?'

'না।' নর্তকী বললো, 'আমি আমার দেহটাকে পবিত্র মনে করি না, এমন দাবীও করি না। কিন্তু আমি আপনার দেহটাকে অপবিত্র করতে চাই না। একজন অপবিত্র লোককে অপবিত্র করায় কোন গ্লানি থাকে না, কিন্তু একজন পবিত্র মানুষকে অপবিত্র করার গ্লানি সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয়।'

কমাণ্ডার তার এ কথা শুনে নির্বোধের মত হা করে তাকিয়ে রইলো। নর্তকী এবার আরো তীক্ষ্ণ তীর ছুঁড়ে মারলো। বললো, 'কোন মেয়েই তার বাবার দেহকে নাপাক করতে চায় না।'

'আহ!' কমাণ্ডার চিৎকার দিয়ে থামিয়ে দিল ওকে। তারপর দীর্ঘ নি:শ্বাস ফেলে বললো, 'ও, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো তুমি। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আর তুমি যে যুবতী!' সে মাথা নত করে বসে রইলো।

নর্তকী উঠে কমাণ্ডারের কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, 'এত নিরাশ হচ্ছেন কেন? আমি তো আপনাকে ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি না। আপনাকে ছলনাও করছি না। যদি আপনি শুধু একজন পুরুষ রূপেই থাকতে চান, তবে আমি না হয় নর্তকী হয়েই থাকবো। আর নিজের মনকে এই বলে বুঝ দেবো, আমার সামনে এমন একটি পুরুষ পড়েছিল, যে লোক আল্লাহর অভিশাপে পড়ে গিয়েছিল। আমি আপনাকে পিতার মত দেখেছি ও দেখছি। আপনি আমার আর দুটো কথা শুনুন, তারপর যা মনে চায় তাই করবেন, আমি মোটেই বাঁধা দেবো

না।'
'কি কথা?'
'আপনার কি মেয়ে আছে?'
'হ্যাঁ, একটি মেয়ে আছে।' কমাণ্ডার উত্তর দিলো।
'তার বয়স কত হবে?'
'বারো বছর।'
'যদি আপনি মারা যান, আপনার স্ত্রী অসহায় ও দারিদ্রের চাপে আপনার মেয়েকে কোন যাত্রা পার্টি বা নাচের দলে বিক্রি করে দেয়, আপনার আত্মা কি শান্তি পাবে? তখন কি আপনার আত্মা মরুভূমি ও এই পাহাড়ে পর্বতে চিৎকার করে বেড়াবে না? আহাজারি করবে না?'
কমাণ্ডার বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম চিকচিক করছে।
নর্তকীও অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। দু'জনই চুপচাপ।
একটু পর মেয়েটি আবার বললো, 'ভুল বুঝবেন না আমায়। মনে করুন আপনি মরে গেছেন, আপনার মেয়ে এক পাপিষ্ঠের সাথে তার তাবুতে বসে আছে। আর সে পাপিষ্ঠ তাকে বলছে, মদ আনো, মদ ছাড়া নারীর কোন মজা নেই।'
কমাণ্ডারের ঠোঁট রাগে, অপমানে ও আত্মধিক্কারে কাঁপছিল। সে সহসা গর্জন করে উঠলো, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও পাজি মেয়ে।'
মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'যদি আমার বাবা জীবিত

থাকতেন, তবে তিনি আমাকে আপনার তাবুতে এভাবে দেখতে পেলে দু'জনকেই খুন করে ফেলতেন।'

কথাগুলো বলার সময় আবেগে থর থর করে কাঁপছিল তার গলা। চোখ থেকে টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রুর ফোঁটা। কমাণ্ডার উঠে তাবুর মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো। নর্তকী কমাণ্ডারের মানসিক অবস্থা ও রাগকে উপেক্ষা করলো না। বললো, 'আমি আপনাকে বৃদ্ধ মনে করে ঘৃণা করেছি, এটা ঠিক না। আমি তো আমার দাদার বয়সী লোকের সাথেও রাত কাটিয়েছি। বয়সের ভার যাকে ভেতর থেকে গুড়ো করে দিয়েছে, সেও তার অর্থের গরমে নিজের লাশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে চায়। আপনি এখনও ততটা বুড়ো হননি। কিন্তু আপনার চেহারার সঙ্গে আমার বাবার এত মিল যে, আমি শেষ পর্যন্ত একজন নর্তকী থেকে এক কন্যা হয়ে গেছি।

আমি আপনাকে যে কথাগুলো বললাম, এসব কথা আমার মাথায় আগে কোনদিন আসেনি। এতদিন আমি জানতাম, আমি শুধু নাচতে জানি এবং মানুষকে আঙ্গুলের ইশারায় নাচাতে জানি। কিন্তু আমি যে এক বাপের কন্যা হতে পারি, আজই প্রথম জানলাম। আমার কথা শুনে আপনি যতো বিস্মিত হচ্ছেন, আমি নিজে বিস্মিত হয়েছি তার চেয়েও বেশী।'

কমাণ্ডার তার দিকে তাকালো, ততক্ষণে তার রাগ পড়ে গেছে।

মেয়েটি আবার বললো, 'আমার মা ও বাবার চেহারা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তাদের কোলে পিঠে মানুষ হয়েছিলাম বড় আদরে। তাদের শরীরের উষ্ণতা ও গায়ের গন্ধ এখনো আমি মনে করতে পারি।

আপনার মেয়ের বয়স বারো, আমার তখন বয়স ছিল নয়-দশ। মা-বাবা আমাকে খুব আদর করতেন। আমার বাবা মিশরের সেনাবাহিনীতে ছিলেন। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্ষমতায় আসার আগেই তিনি শহীদ হন।

আমার মা তখনও যুবতী। আমরা ছিলাম গরীব। মা আমাকে একটি লোকের হাতে তুলে দিলেন। সে লোক আমার সামনেই মার হাতে আমার মূল্য গুণে দিলো।

লোকটি মাকে বললো, 'আপনার মেয়েকে আমি বড় ঘরে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দেবো।'

বিদায় নেয়ার সময় আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। মা আমাকে শান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'লোকটি তোমার বাবার বন্ধু। সে তোমাকে তোমার বাবার মতই আদরে রাখবে।'

আমি বারো বছর ধরে আছি লোকটির সাথে। লোকটি আমাকে শুধু আশ্বাস দিচ্ছে, 'তোমার নাচ-গান শেখা হলেই তোমাকে ভাল বর, ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিয়ে দেবো।'

কিন্তু এখন আমি বড় হয়েছি। বুঝতে পারছি, লোকটি আমার বাবার বন্ধু নয়, বাবাকে সে দেখেওনি কোনদিন। এ লোক কোনদিন আমাকে বিয়ে দেবে না। আমাকে বিয়ে দিলে যে তার আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে!

এ লোক আমাকে নর্তকী হতে বাধ্য করলো। নেচে গেয়ে মানুষের মনোরঞ্জনই পেশা হয়ে গেলো আমার।

অবশ্য এ লোক আমাকে স্নেহ করেন না, এমন নয়। তিনি আমার মালিক এবং আমার উস্তাদও। আমার সঙ্গে তিনি খুব সদয় ব্যবহার করেন। আমাকে ভাল ভাল খেতে দেন, পরতে দেন।

যখন আমি পরিপূর্ণ যুবতী হলাম তখন আমি নিজেকে নতুন করে চিনতে শিখলাম। বুঝতে শিখলাম আমার জীবনের মূল্য। আর যেদিন আমি তা বুঝতে পারলাম, সেদিন থেকেই আমার আশা ভরসা ও সব স্বপ্ন কল্পনা নিঃশেষ হয়ে গেল।

আমি এখন এক মনোরম মাটির পুতুল। মানুষ এ পুতুল আদর করে মজা পায়, কিন্তু তাতে পুতুলের কিছু যায় আসে না। কিন্তু আপনাকে দেখে এ পুতুলে আবার প্রাণ ফিরে এলো। জেগে উঠলো বাবা মায়ের সেই আদর ও সোহাগের স্মৃতি।'

কথা বলছিল মেয়েটি, কিন্তু তার চোখ দিয়ে অনর্গল গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগলো, 'এখন আমার এমন মনে হচ্ছে, যেন আমার বাবার আত্মা এই তাবুর আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে। এই তাবুতে আসার আগে আমি কি ছিলাম আর এখন কি হয়ে গেলাম! এমনটি কখনও হয়নি আমার। এখন মনে হচ্ছে, আমার পিতার আত্মা আমার চারপাশে ব্যাকুল হয়ে ছুটাছুটি করছে।'

'তোমার নাচ দেখে বুঝতে পারছি, তুমি বেশ দামী নর্তকী।

আমীরদের মহল ও চোখ ধাঁধাঁনো সরাইখানাতেই মানায় তোমাকে। কিন্তু তুমি শহর ছেড়ে এই মরুভূমিতে কেন এসেছো?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কমাণ্ডার।
'আমি উপযুক্ত মূল্য পেয়েই এখানে এসেছি।' নর্তকী বললো, 'আমি দলের কাউকে চিনি না। আমাকে শুধু বলা হয়েছে, সীমান্তে যেতে হবে আর সেখানে যে সকল সেনা ফাঁড়ি রয়েছে, সেখানকার সিপাহী ও কমাণ্ডারদের মনোরঞ্জন করতে হবে। এর জন্য আমি নতুন করে কোন মূল্য নিতে পারবো না। সৈন্যদের বিনা মূল্যে নাচ দেখাতে ও খুশী করতে হবে আমাকে।'
'তুমি জানো না, সৈন্যরা দীর্ঘদিন আত্মীয় পরিজন থেকে দূরে থাকতে থাকতে এক সময় নেকড়ে হয়ে যায়? জেনে শুনে তুমি এই নেকড়ের খাঁচায় আসতে রাজি হলে?'
'কেন আসবো না! আমি কি এক শহীদ পিতার সন্তান নই? দেশের জন্য আমার বাপ জান দিতে পারলে আমি কি দেশের সেবায় নিয়োজিত মুজাহিদদের একটু মনোরঞ্জনও করতে পারবো না! যে সব সিপাহী ও কমাণ্ডার মিশরের সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত, তাদের আমি সেবা করতে পারছি, এটাই তো আমার বড় পাওয়া!
এই সিপাহীদের খুশী করাই আমার ডিউটি। আমার এই নাচগানে মুজাহিদ পিতার উত্তরসূরীরা যদি চাঙ্গা হয়ে উঠে, যদি তাদের একঘেঁয়েমি দূর হয়, আর তাই দেখে যদি আমার শহীদ পিতার আত্মা শান্তি পায়, তবে কেনো আমি তা করবো

না!'

কমাণ্ডার এক বাপ হারা মেয়ের বিলাপ শুনছিল, শুনছিল এক নর্তকীর দেশপ্রেমের কাহিনী। বললো, 'আমি দুঃখিত, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। এতদিন জানতাম, দেশপ্রেম সৈনিকদের নিজস্ব সম্পদ। আমার সে ভুল ধারনা ভেঙে গেছে, ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার পর্দা সরে গেছে আমার চোখ থেকে। আজ বুঝতে পারছি, দেশপ্রেম কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর নয়, দেশপ্রেম দেশের সকল মানুষের সবচে প্রিয় ও আদরের সম্পদ। এর জন্য যে কোন ত্যাগ যে কোন সময় হাসিমুখে যারা বরণ করে নিতে পারে, তারাই সত্যিকার মুজাহিদ। তুমি আমাকে কি ভ্রান্তি ও ধোঁকার হাত থেকেই না বাঁচালে!'

'আমি আপনাকে কি ধোঁকা থেকে বাঁচাবো, আমার নিজের জীবনটাই তো এক মস্ত ধোঁকা। এ জীবন যেমন নিজের জন্য ধোঁকা তেমনি অপরের জন্যও। কিন্তু তাই বলে আমি স্বদেশের মুজাহিদদের নাপাক করতে পারবো না। ওই ক্যাম্পের কমাণ্ডার আমাকে তার তাবুতে ডেকেছিল। আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে চলে এসেছি। কিন্তু আপনার কাছে শুধু এ জন্যই এসেছি, আপনার চেহারা অবিকল আমার বাবার মত।'

নর্তকী নতজানু হয়ে বসে ভক্তি সহকারে কমাণ্ডারের একটি হাত তুলে নিয়ে প্রথমে চোখে মুখে লাগালো, পরে সে হাতে চুমো খেল। কমাণ্ডার অপর হাত মেয়েটির মাথায় বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কি?'

'আমার মালিক আমাকে চুমকি বলে ডাকে।' নর্তকী বললো, 'কিন্তু আমার বাবা আমাকে জোহরা বলে ডাকতেন।'
'যাও জোহরা, তুমি তোমার তাবুতে চলে যাও।' কমাণ্ডার আদর ও স্নেহ মিশ্রিত কণ্ঠে বললো তাকে।
'আগে আপনি শুয়ে পড়ুন।' জোহরা বললো, 'ছেলেকে ঘুম না পাড়িয়ে কোন মা কি ঘুমুতে যেতে পারে!'
তার কথা শুনে প্রশ্রয়ের একটুকরো হাসি উপহার দিল কমাণ্ডার, মেয়েটিও যোগ দিল সে হাসিতে।

রাত পেরিয়ে যাচ্ছে। দু'জন বাদক তাবুতে জেগে বসে বসে কাটিয়ে দিচ্ছে রাত। অন্য নর্তকী ও বাদকেরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন।
জাগ্রত দু'জনের একজন বললো, 'আমরা বোধহয় একটি কাজ ঠিক করছি না। মেয়েদেরকে আমরা এই বলে এনেছি, তারা শুধু নাচগান করে সিপাইদের মনোরঞ্জন করবে। কিন্তু আমাদের মিশনের আসল উদ্দেশ্য তারা জানে না। জানা থাকলে, এই যে তাদের তাবুতে পাঠানো হচ্ছে, এ নিয়ে তাদের কোন প্রশ্ন থাকতো না।'
'না, আমরা ঠিকই করেছি। কোন নর্তকীকে বিশ্বাস করা যায় না। ধরো, কমাণ্ডারের তাবুতে যে মেয়েটি রয়েছে, সে যদি জানতো আমরা সীমান্তের ক্যাম্পগুলোতে এসেছি এখানকার সিপাহীদের ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতে, আর আবেগের বশবর্তী হয়ে কিংবা পুরস্কারের লোভে বলে দিত সে গোপন

কথা, তাহলে কি উপায় হতো আমাদের? আমাদের গোপন উদ্দেশ্য কোন নর্তকীকেই বলা উচিৎ হবে না।
নর্তকীদের আমরা তাদের পাওনার অতিরিক্ত মজুরী দিয়েছি। এখন একটু বাড়তি কাজ পড়ে গেলে খুশী হয়েই তারা তা করে দেবে।'
'কিন্তু যদি আমরা তাকে আমাদের উদ্দেশ্য ও প্ল্যানের কথা বুঝিয়ে বলতাম, তবে মেয়েটা কমাণ্ডারকে আরো ভালমত বাগিয়ে নিতে পারতো। হয়তো দেখা যেতো, কমাণ্ডার জালে ফেঁসে নিজেই হাবশী সৈন্যদের মিশরে প্রবেশের ব্যবস্থা করছে।'
'আমাদের কমাণ্ডার আমাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধি রাখেন। এ সব নর্তকী মেয়েরা আমাদের হাতের অস্ত্র। হাতের অস্ত্রকে কেউ কোনদিন গোপন তথ্য জানায় না।'
কমাণ্ডার প্রশান্ত মনে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়েছিল। নর্তকী তাকে ভীষণ এক পাপ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, এ জন্য সে মনে মনে শান্তি ও স্বস্তি বোধ করছিল। তার বুকে জেগে উঠেছিল পিতার মমত্ববোধ ও স্নেহ।
নর্তকী তার প্রশান্ত চেহারার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। যখন কমাণ্ডারের চোখ ঘুমে বুঁজে এলো এবং জোহরার অশ্রু ভেজা চোখ দুটো আবার ঝাপসা হয়ে এলো, তখন সে তাবু থেকে বেরিয়ে নিজের তাবুতে গিয়ে শুয়ে পড়লো।
রাত তখন সামান্যই বাকী ছিল। এক সময় তাও শেষ হয়ে

গেল। ফজরের আজান হলো। সৈন্যরা উঠে অজু করে নামাজ পড়লো। নাচের দলের লোকদের যখন ঘুম ভাঙলো, তখন অনেক বেলা। সূর্য অনেক উপরে উঠে উত্তাপ ছড়িয়ে গরম করে তুলছে মরুর বালু।

মেয়েদের জানা ছিল না, এরপর তাদের কোথায় যেতে হবে। বাদক দলের সাথে পথ চলাই তাদের কাজ। ওরা যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই সঙ্গে যাবে এরা।

বাদক দল যাওয়ার জন্য তৈরী হলো। কমাণ্ডারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলো ওরা। কমাণ্ডার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, জোহরা দৌড়ে তার কাছে এলো এবং বললো, 'আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আশির্বাদ করে দিন।'

কমাণ্ডার তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। জোহরা তার অন্য হাতটি ধরে তার চোখের সাথে লাগালো। সে চোখ থেকে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। অশ্রু ঝরা চোখেই বিদায় নিল জোহরা।

নীলনদের দিকে চলে গেল ওরা। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে খুব বেশী দূর যায়নি, কোত্থেকে দুই উটের আরোহী এগিয়ে এলো। ওদের কাছে এসে উটের ওপর থেকে নামলো আরোহীরা। উট দু'টিকে বসিয়ে নর্তকী দু'জনকে উটের পিঠে বসালো, উট আবার যাত্রা শুরু করলো।

এই দুই উটওয়ালা সন্ত্রাসী দলের লোক, কাছেই কোথাও লুকিয়ে ছিল ওরা। এরা নীলনদের পাড়ে অবস্থানরত বণিক দলের সাথে গিয়ে মিলিত হলো।

দুই দল এমনভাবে মিলিত হলো, দেখে মনে হলো, এরা একে অন্যকে চেনে না।
পুরুষরা মিশনের কার্যক্রম ঠিক করার জন্য বৈঠকে বসবে, তাই নর্তকী দু'জনকে ওখান থেকে সরিয়ে দিতে চাইল।
এ কাজে এগিয়ে এলো বণিক দলের মেয়েরা। ওরা দুই নর্তকীকে পুরুষদের থেকে আলাদা করে নদীর কূলে নিয়ে গেল। মেয়ে চারজন প্রথমে নিজেদের পরিচয় দিল। বললো, 'আমরা আমাদের স্বামীদের নিয়ে কাফেলার সাথে বেড়াতে এসেছি।'
এরপর ওরা জানতে চাইল নর্তকীদের পরিচয়। জোহরা ও অন্য নর্তকী বললো, 'আমাদেরকে নাচগান করে সীমান্ত এলাকার সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য ভাড়া করে আনা হয়েছে।'
ওদিকে পুরুষদের বৈঠকে মিশনের মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। বাদক দল তাদের দুই রাতের কাজ ও সাফল্য বর্ণনা করলো। উটের আরোহীরা জানালো, 'তাদের দুই রাতের নাচগানের সুযোগে প্রায় দুইশ হাবশীকে মিশরে প্রবেশ করানো হয়েছে।'
বণিক দল বর্ণনা করলো তাদের দুই মেয়ের সাফল্যের কথা। বললো, 'এই সুযোগে আমরাও দু'শোর বেশী হাবশী ভেতরে প্রবেশ করিয়েছি।'
আলাপ আলোচনার পর তারা এই সিদ্ধান্তে এল, 'নাচগানের চেয়ে নদী পথেই বেশী করে হাবশী সৈন্য ভেতরে প্রবেশ

করানো নিরাপদ ও সুবিধাজনক। এ পথ উন্মুক্ত থাকলে নৌকাযোগে বেশী করে সৈন্য আমদানী করা যাবে। এ জন্য বণিক দলের দুই মেয়ে যেভাবে দুই সীমান্ত প্রহরীকে কব্জা করেছে প্রয়োজনে অন্যান্য সকল মেয়েকেই এ ভূমিকায় নামতে হবে।

এতে করে নির্বিবাদে প্রতি রাতে অনেক নৌকা আসতে পারবে। সে জন্য নর্তকী মেয়ে দুটিকেও এখানেই রেখে দিতে হবে। কিন্তু তাদের কাছে কোন গোপন তথ্য ফাঁস করা যাবে না।'

বাজনাদাররা জোহরা ও তার সাথের নর্তকীকে বললো, 'তোমাদের কাজ এখন শেষ! নদীর পাড়ে এ জায়গাটি খুবই সুন্দর ও মনোরম। আমরা কয়েকদিন এখানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অবসর বিনোদনের জন্য এমন চমৎকার জায়গা আর হয় না। এসে যখন পড়েছি, কয়েকদিন বেড়িয়ে না গেলে জীবনভর দুঃখ থাকবে। বলি কি, তোমরাও থেকে যাও এখানে।'

তারা নর্তকী দু'জনকে এমন প্রলোভন দিল যে, শেষে তারা সেখানে থাকতে রাজী হয়ে গেল।

কাফেলার মেয়েরাও তাদের সাথে অন্তরঙ্গ এবং খোলামেলা ব্যবহার করলো। ফলে অপরিচিতের দূরত্ব ঘুচে গেল। স্বচ্ছন্দভাবেই ওদের সাথে মিশে গেল দুই নর্তকী।

কাফেলার লোকদের থেকে সামান্য একটু দূরে তাবু টানানো হলো ওদের জন্য।

রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু ঘুম এলো না জোহরার চোখে। বার বার তার স্মরণ হতে লাগলো কমাণ্ডারের কথা। তার চরিত্র, তার ব্যবহার জোহরার মনে অক্ষয় স্মৃতি হয়ে আছে। তার স্নেহমাখা কথা, মাথায় হাত বুলিয়ে বাপের মতই আদর করা, সবকিছু ছবির মত ভেসে উঠছিল তার অন্তর রাজ্যে। এই কমাণ্ডারের মধ্যে সে সত্যি তার পিতার ছবি দেখতে পেয়েছিল।

কমাণ্ডারের প্রতি আরো একটি কারণে কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠেছিল। এই প্রথম কোন পুরুষ তাকে নাগালের মধ্যে পেয়েও খেলার সামগ্রী না বানিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আশির্বাদ করেছে। এ ছাড়া কমাণ্ডার তাকে চুমকি না বলে তার বাবার মত জোহরা বলে ডেকেছে।

তার সঙ্গী নর্তকী ঘুমিয়ে পড়েছিল। দলের বাজনাদারেরাও ঘুমিয়ে গিয়েছিল। সে বিছানায় উঠে বসলো এবং একসময় ধীরপদে বাইরে চলে এলো।

সেনাক্যাম্পে যাওয়ার রাস্তা তার স্পষ্ট মনে আছে। জোহরার কি মনে হলো, সে দীর্ঘ পদক্ষেপে দ্রুত ক্যাম্পের দিকে হেঁটে চললো।

নির্জন রাতে একাকী পথ চলার মত দুঃসাহসী কোন মেয়ে ছিল না জোহরা। কিন্তু কি এক আবেগের তাড়না তাকে ভয়শূন্য করে ফেললো। সে নির্ভয়ে এগিয়ে চললো ক্যাম্পের দিকে।

এক সময় শেষ হলো তার পথ চলা, ক্যাম্পে পৌঁছে গেল সে।

প্রহরী তাকে দেখেই চিনতে পারল। সে প্রহরীকে বললো, ‘কমাণ্ডারের কাছে যাচ্ছি।’
প্রহরী তাকে বাঁধা দিল না, কারণ গত রাতেও এই মেয়ে দীর্ঘক্ষণ কমাণ্ডারের তাবুতে ছিল, জানে সে। জোহরা সরাসরি কমাণ্ডারের তাবুতে গিয়ে প্রবেশ করলো।
কমাণ্ডার গভীর ঘুমে নিমগ্ন। কিন্তু সৈনিক সুলভ সতর্কতা তাকে জাগিয়ে দিল। ঘুম ভাঙতেই অন্ধকারে চোখ মেলে তাকাল কমাণ্ডার। একটি কোমল হাতের মুঠোর মধ্যে নিজের হাতটিকে আবিষ্কার করে বিস্মিত হলো সে। হাতের কোমলতাই বলছিল, এটা কোন পুরুষের হাত নয়!
সে দ্রুত উঠে হতচকিত হয়ে বললো, ‘কে তুমি?’
‘আমি জোহরা!’
কমাণ্ডারের বিস্ময় তখনো কাটেনি। বললো, ‘তুমি! এত রাতে! এখানে!’
‘ভয় পাচ্ছো কেন? বাপের কাছে মেয়ে আসবে না?’ জোহরা তাকে বললো, ‘কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বার বার কেবল তোমার কথাই মনে হচ্ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল তোমাকে একটু দেখি। ভয় নেই, তুমি শুয়ে থাকো, একটু পরই আমি চলে যাবো।’
কমাণ্ডার বাতি জ্বাললো। জিজ্ঞেস করলো, ‘এখন কোত্থেকে এসেছো?’
জোহরা সব খুলে বললো।
জোহরার কথা শুনে কমাণ্ডার কামরা থেকে বের হয়ে গেলো।

দু'টি ঘোড়া রেডি করে জোহরাকে বললো, 'চলো।'
জোহরাকে একটি ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দিয়ে অন্যটিতে উঠে বসলো নিজে। ঘোড়া চলতে শুরু করলো।
চলার পথে জোহরা আবেগে অনর্গল কথা বলতে লাগলো। কমাণ্ডার তাকে তার উচ্ছ্বাস প্রকাশে কোন রকম বাঁধা দিল না। যথেষ্ট দরদ ও মমতা নিয়ে শুনতে লাগলো তার কথা।
আরেকটু পরেই তারা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। এখান থেকেই ওরা দেখতে পাচ্ছিল বাগান ও ক্যাম্প। জোহরা কমাণ্ডারকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'এবার আপনি ফিরে যান।'
কমাণ্ডার তার মাথায় হাত রেখে আদর করলো। আশির্বাদ করে বললো, 'ভাল থেকো।'
জোহরা ক্যাম্পে ফিরে দেখলো ক্যাম্পের এক লোক জেগে বসে আছে। সে জোহরাকে জিজ্ঞেস করলো, ' কোথায় গিয়েছিলে?'
জোহরা বললো, 'ঘুম আসছিল না, তাই একটু নদীর পাড়ে হাঁটতে গিয়েছিলাম।'
লোকটি তাকে সাবধান করে দিয়ে বললো, 'তোমার আচরণ সন্দেহজনক। তুমি ঠিক করে বলো, এত রাতে একা তুমি কোথায় এবং কেন গিয়েছিলে? মিথ্যে বলো না, যা সত্যি তাই বলে ফেলো।'
জোহরা তাকে সত্যি ঘটনা বলতে চাচ্ছিল না। সে আবারো বললো, 'বললাম তো, নদী পাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম।'
'এখন থেকে তুমি আমার আদেশ ছাড়া এক পাও বাইরে

যেতে পারবে না।' লোকটি আদেশের সুরে বললো।
'আমি তোমার কেনা দাসী নই।' জোহরা বললো, 'আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলে সে কাজ আমি শেষ করেছি। যে মূল্য দিয়েছিলে, সে মূল্য পরিশোধ করেছি। এখন আর আমি কারো আদেশের ধার ধারি না।'
'তুমি কি তোমার মালিকের কাছে জীবিত ফিরে যেতে চাও না?' সে লোক বললো, 'যদি চাও তবে আমার অবাধ্য হয়ো না। আমি নিষেধ করছি, আমাকে না বলে কোথাও যেয়ো না তুমি।'

দুই সিপাহীই প্রতি রাতে টহল দেয়ার বাহানায় নদীর পাড়ে গিয়ে ওই মেয়েদের সাথে মিলিত হতো। দুই মেয়ে দু'জনকে নিয়ে যেত আলাদা আলাদা জায়গায়। সেখানে নানা রকম প্রলোভনে আটকে রাখতো তাদেরকে।
সৈন্যরা যখন মেয়েদের নিয়ে পাহাড়ের গুহায় সময় কাটাতো, সেই সময় হাবশী সৈন্য বোঝাই পাল তোলা নৌকা এসে ভিড়তো কূলে। সঙ্গে সঙ্গে হাবশী সৈন্যরা লাফিয়ে নেমে হারিয়ে যেতো পাহাড়ের অন্তরালে, অদৃশ্য গোপন আস্তানায়।
এভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই পাহাড়ের গোপন আস্তানায় হাবশী সৈন্যদের বিশাল বহর জমা হয়ে গেল। এখন তারা যে কোন সময় আক্রমণ চালিয়ে ফাঁড়ি দুটোর সৈন্যদের নিঃশেষে ধ্বংস করে দিতে পারে।
কিন্তু তাদের কমাণ্ডার বুদ্ধিমান। সে জানে ফাঁড়িতে আক্রমণ

করলে সে সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে কায়রো পৌঁছে যাবে। তার পরিণাম হবে খারাপ। কায়রো থেকে নতুন সেনাবাহিনী এসে দায়িত্ব নেবে ক্যাম্পের। এতে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যা হবে। অতর্কিতে কায়রো দখলের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারে তারা। তাই এ ধরনের আত্মঘাতি আক্রমণের ধারে কাছেও গেল না সে।

পাহাড়ী এলাকায় হাবশীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সুদানে প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্রুসেডাররা। এই মিশনের কমাণ্ডার, যে কায়রোতে এই অতর্কিত আক্রমণের নেতৃত্ব দেবে, সবকিছু বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।

কয়েক দিনের মধ্যেই সীমানা পেরিয়ে সে এই পাহাড়ী ক্যাম্পে হাজির হবে। তারপর এখানে জমায়েত হাবশীদের নিয়ে পৌঁছবে কায়রোর আশেপাশে এবং সুযোগ মত আক্রমণ চালিয়ে দখল করে নেবে কায়রো।

সেনাপতি আলকিন্দি এখন কায়রোতে অবস্থান করছেন। নিজের দায়িত্ব পালন করতেই কায়রো গিয়েছেন তিনি। তার গতিবিধি ও হাবভাব দেখে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না, এ লোক কোন ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত। এই অতি বিশ্বস্ত লোকটিই বিশ্বাসঘাতকের প্রধান হয়ে ছোবল হানতে যাচ্ছে আইয়ুবীকে।

প্রতিদিন রাতে সীমান্তের রিপোর্ট নিয়ে গোপনে তার কাছে পৌঁছে যায় কাসেদ। গত রাতে কত হাবশী সেনা পাহাড়ী অঞ্চলে এসে পৌঁছেছে, এখন সেখানে তাদের সংখ্যা কত,

সবই সময় মত জানতে পারেন তিনি।
সুদানীরা জানিয়েছে, এ আক্রমণের মূল নেতা তিনিই থাকবেন। অন্যান্য দলনেতারা তার হুকুমেই আক্রমণের নেতৃত্ব দেবে। তাই তিনি তার প্ল্যান প্রোগ্রাম গুছিয়ে নিচ্ছিলেন।
হাবশী সৈন্যের সংখ্যা এক হাজারে পৌছে গেছে। অভিযানে বেরিয়ে পড়ার সময় হয়েছে, জানানো হলো তাদের। তারা বললো, 'কিন্তু নরবলি? নরবলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো আমরা কোন অভিযানে শরীক হতে পারবো না।'
আলকিন্দির লোকেরা এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু হাবশীরা তাদের দাবীতে অটল। তাদের সাথে যে ধর্মগুরু এসেছে, সে বললো, 'এ বিধান লংঘন করলে এরা যুদ্ধ করতে পারবে না। বলি দেয়া মানুষের রক্ত না ছোঁয়া পর্যন্ত তাদের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি হয় না।'
আলকিন্দির লোকেরা বিপাকে পড়ে গেল। কোথায় পাবে তারা বলি দেয়ার জন্য জীবন্ত মানুষ!
হাবশীরা বলতে লাগলো, 'হয় নরবলি দাও, নইলে আমরা দেশে ফিরে যাবো।'
তাদের ধর্মীয় নেতাকে বলা হলো, 'হাবশীদের মধ্য থেকে দু'একজনকে ধরে বলি দিয়ে দিলেই তো হয়ে যায়!'
ধর্মগুরু বললো, 'এ কোরবানী গ্রহণযোগ্য হবে না। বলির জন্য সেই অঞ্চলের মানুষ আনতে হবে, যে অঞ্চলে আক্রমণ করা হবে। যারা যুদ্ধ করতে এসেছে তাদের কোরবানী বৈধ

নয়।'
শেষ পর্যন্ত তাকে বলা হলো, 'ঠিক আছে, আক্রমণের আগের দিন মিশর থেকে এক লোককে ধরে এনে আপনার হাতে তুলে দেয়া হবে।'
পুরোহিত রাজি হলো না। বললো, 'বলির লোক এখনই চাই। কারণ তাকে ভাল খাইয়ে দাইয়ে মোটা তাজা করতে হবে। তারপর দেখতে হবে সে লোক আপন দেবতার আরাধনা করে কি না।'
বলি দেয়ার বিষয়টি বেশ জটিল হয়ে উঠল। পুরোহিত একটার পর একটা নতুন নতুন ফ্যাকড়া সৃষ্টি করতে লাগলো। বললো, 'আমরা ইচ্ছা করলেই যাকে তাকে বলি দিতে পারবো না। আমাদের হিসাব করে দেখতে হবে, দেবতা পুরুষের কোরবানী চান না নারীর কোরবানী? নাকি দু'জনের কোরবানীই চেয়ে বসেন দেবতা তাও জানতে হবে। এবং সে চাহিদা অনুযায়ীই বলি সম্পন্ন করতে হবে।'
সেই রাতেই আলকিন্দির কাছে সংবাদ গেল, 'হাবশীরা যুদ্ধের আগেই কোরবানীর জন্য মানুষ চায়।'
আলকিন্দি বললো, 'তাতে চিন্তার কি আছে? পথঘাট থেকে কাউকে ধরে তাদের হাতে তুলে দাও।'
'কিন্তু পুরোহিত এখনো বলেনি, তাদের দেবতা পুরুষ, নারী, নাকি উভয়েরই রক্ত চায়? এটা জানার আগে আমরা কাকে ধরবো? কেমন করে ধরবো?'
'আমি এত কথা শুনতে চাই না। তাদের যে দাবীই থাক,

পূরণ করে দাও।' আলকিন্দি বললো, 'কয়েকদনি পর যখন আমি কায়রোর উপরে আক্রমণ চালাবো, তখন কত লোক মারা যাবে তার কোন ইয়াত্তা নেই! দু'একজন লোক দু'দিন আগে মারা গেলে এমন কি আর ক্ষতি হবে!'

আলকিন্দি তার গোয়েন্দার সাথে কথা বলছিল, একজন খৃস্টান এসে ভেতরে ঢুকলো। তার পরণে মিশরীয় পোষাক। ভেতরে প্রবেশ করেই সে তার কৃত্রিম দাড়ি ও মেকাপ খুলে ফেললো। আলকিন্দি জিজ্ঞেস করলো, 'আপনাকে পেরেশান মনে হচ্ছে?'
'হাবশীরা তাদের ধর্মীয় বিধান পূর্ণ করতে চায়। তারা এখনি বলি দেয়ার জন্য মানুষ চাচ্ছে।'
'আপনি কি চিন্তা করেছেন?'
'আমি চিন্তা করেছিলাম, আক্রমণের একদিন আগে একটি লোক ধরে ওদের হাতে সঁপে দেবো।'
'আপনি ঠিকই চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু ওরা কি তা মানবে?'
'না!' খৃস্টান বললো, 'তারা এক্ষুণি কোরবানী চায়।'
'এ অবস্থায় আপনার পরামর্শ কি?'
'আপনি তাদের ধর্মীয় রসম পালন করার সুযোগ করে দিন। আপনি তো কখনও সুদানে যাননি, তাই জানেন না কেমন করে আমরা এতগুলো লোক সংগ্রহ করেছি। এই নরহত্যার চিন্তা আমিই তাদের মাথায় ঢুকিয়েছিলাম। ধর্মের কথা বলে কৌশলে তাদেরকে ওখানে নিয়ে এসেছি।
সুলতান আইয়ুবী আপনাকে শুধু যুদ্ধ করতেই শিখিয়েছেন,

মানুষ ব্যবহারের কৌশল শেখাননি। মানুষকে বিনা তলোয়ারে হত্যা করার কৌশল আমাদের খৃস্টানদের কাছ থেকে শিখে নিন। অন্যের ধর্মকে ব্যবহার করতে শিখুন।

তাদের উপরে ধর্মের উন্মাদনা চাপিয়ে দিয়ে তাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিন। তাদের অর্থহীন ও বাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে নিন্দা ও সমালোচনা না করে তাদের আরও উৎসাহিত করে নিজেও তাদের সঙ্গে লোক দেখানো অংশীদার হয়ে তাদেরকে হাতের মুঠোয় রাখুন।

সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে ধোঁকা দেয়া অন্য যে কোন কৌশলের চেয়েও বেশী কার্যকর হয়। আমরা যত মুসলমানকে আমাদের সঙ্গী বানিয়েছি, তাদেরকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছি এই ধোঁকা ও কৌশলের মাধ্যমে। মুসলমানরা ধর্মীয় আবেগেই আমাদের জালে এসেছে। আর এই হাবশীরা তো একদম জংলী। এদেরকে আমরা এক বছরের বেশী সময় ধরে নির্বোধ বানিয়ে রেখেছি। সুদান থেকে রওনা হওয়ার আগে আমরা দু'জন সুদানীকে তাদের হাতে দিয়ে বলেছি, এরা মিশরী লোক। তারা তাদেরকে জবাই করে তবেই সুদান থেকে রওনা দিয়েছে।'

'হাবশী পুরোহিত কি বলেছে, সে পুরুষ লোক চায়, না নারী?' আলকিন্দি জিজ্ঞেস করলো।

'সে কি চায় তা ওখানে গেলেই জানতে পারবেন। আমি মনে করি, এখনি আপনার সেখানে যাওয়া বিশেষ দরকার।' খৃস্টানটি বললো, 'তবে আমি আপনাকে অন্য রকম পদ্ধতি ও

কৌশলে তাদের সামনে উপস্থিত করতে চাই। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, হাবশীদের মতো এত বেশী পশু, বর্বর এবং খুনপিয়াসী যোদ্ধা আর কোন জাতিতে পাবেন না। এ পর্যন্ত এদের সংখ্যা চার হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে।
যদি আমরা তাদের উপরে ধর্মীয় ভূত চাপিয়ে রাখতে পারি, এবং তাদের এ বিশ্বাস দিয়ে রাখতে পারি যে, এ যুদ্ধ আমাদের জন্য নয়, এ যুদ্ধ তাদেরই জন্য, তবে তাদের এক হাজার সৈন্যই কায়রোর সমস্ত সৈন্যকে লাশে রূপান্তরিত করে দেবে।
আমি তাদের জানিয়েছি, আমরা তাদেরকে তাদের ভগবানের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। আর সেই ভগবানের জমিন এখন শত্রুদের অধিকারে।'
খৃস্টানটির প্রস্তাবে রাজি হলো আলকিন্দি। বললো, 'হ্যাঁ, আমি যাবো ওখানে।'

আলকিন্দির সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে সুদানী ও ক্রুসেডারদের মধ্যে চুক্তি হয়ে গেছে। চুক্তি মোতাবেক মিশরকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হবে। এক অংশের সুলতান হবে আলকিন্দি আর অবশিষ্ট অর্ধেক সুদানকে দিয়ে দেয়া হবে। হাবশী সৈন্যদের যোগাড় করার সময়ও সুদানীরা এরকম চুক্তি করেছিল।
সে যুগের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ তার ডাইরীতে লিখেছেন, 'আলকিন্দি খৃস্টানদের ও সুদানীদের

সাহায্যে সভ্যতা ও কৃষ্টি বিবর্জিত পশু প্রকৃতির হিংস্র স্বভাব হাবশীদের ওপর তাদের ধর্মীয় ভূত চাপিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করেন এবং আলকিন্দি নিজেই তাদের ভগবান হয়ে গিয়েছিলেন। হাবশীদেরকে বলা হয়েছিল, এই লোক তোমাদের ভগবান, যিনি কয়েকশ বছর আগে ভগবানদের নেতার কাছে গিয়েছিলেন।'

ডাইরীতে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে সুলতান ইউসুফ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এ মহান মুজাহিদের আসল নাম ছিল ইউসুফ সালাহউদ্দিন। কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ তাকে স্নেহ ও আদর করে সুলতান ইউসুফ বললেও ইতিহাসে তিনি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নামেই প্রসিদ্ধ হন। তিনি জানতেও পারলেন না, তার অনুপস্থিতিতে মিশরে কি ভয়ংকর খেলা চলছে। তকিউদ্দিন নিশ্চিন্ত, আলকিন্দির মত বিশ্বস্ত সেনাপতি সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। আলী বিন সুফিয়ানও টের পেলেন না আলকিন্দির ষড়যন্ত্রের কোন খবর। কিন্তু বসে নেই আলকিন্দি। বসে নেই সুদানী ও খৃস্টান ষড়যন্ত্রকারীরা। দশ হাজার হাবশী নিগ্রো সেনা প্রস্তুত মিশরে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য। যে কোন মুহূর্তে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ঘুমন্ত কায়রোবাসীর ওপর।

####

পরবর্তী বই ক্রুসেড-১২

গোপন বিদ্রোহী

চারদিকে চক্রান্ত
আসাদ বিন হাফিজ
ক্রুসেড-১১
প্রকাশন